ব্যাবিলন কথকতা

৬ষ্ঠ সংখ্যা
১৬ই ডিসেম্বর ২০১১

ব্যাবিলন গ্রুপ

Babylon Trims Ltd.

Babylon Trims Ltd. is one of the leading readymade garment accessories manufacturers of the country. Since its inception in the year 2003, it kept on its pace to develop itself by its continuous efforts, constant improvements and commitments.

Babylon Trims Ltd. is nominated and certified by the buyers/agencies:

- David Howard UK for all packaging trims
- JC Penney for Polybags
- Forest Stewardship Council [FSC] for printing
- Wal Mart

Babylon Trims Ltd. is a combination of state of the art of machinery and a band of energetic workforce with an aim to give the customers quality goods on time. Customer satisfaction is the ultimate aim of Babylon Trims Ltd.

Products:

- Carton Box
- Poly Bag
- Zip Lock Poly Bag
- Back Board
- Neck Board
- Hanger
- Plastic Clip
- Collar Insert
- Butter Fly
- Tie Bed
- Gum Tape
- Tissue Paper
- Printed Label
- Care Label
- Hang Tag
- Barcode Sticker
- Photo Inlay
- Carton Sticker
- Size Sticker

Kandi Boilarpur, Horindhara, Union-Tetuljhora, Savar, Dhaka, Bangladesh.
Tel: 8023495-6, 8023462-3, Fax: 88-02-8015128

Babylon Printers Limited

A Complete Specialized Screen Print Factory

Daily 60000 (sixty thousand) pcs normal or
single color rubber print, daily 40000 pcs 2/3/4 color rubber print

All machines and accessories are imported from Korea, Thailand & China.

Use of Dyes/Chemical: Binder APEO free, Fixer Non Formalin, Anti Flame Agent, AZO Free Dyes/Chemical, (All chemicals are of Japan origin).

Products:

a. Rubber beige
b. Oil beige (Plastisol print/Hi- density)
c. Pigment (oil beige/water beige)
d. Flock print
e. Foil print
f. Discharge print
g. Puff print
h. Volcanic print
i. Glitters print
j. Photo print
k. Crack Print
l. Sticker Print

Plot # 23-24, Union-Tetuljhora, Hemayetpur, Savar, Dhaka, Bangladesh.
Tel: 7743280-87, Fax: 88-02-7743279

সূচিপত্র

সম্পাদক:
এমদাদুল ইসলাম

সহ-সম্পাদক:
শামীমুল ইসলাম

বিশেষ সহযোগিতা:
মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
সালমা সুলতানা

অলংকরণ:
ফারহানা রহমান সুরভী

প্রচ্ছদ ও শিল্প নির্দেশনা:
স্বাধীন খান

সার্বিক সহযোগিতা:
ব্যাবিলন পরিবার

মুদ্রণ:
অক্ষর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
৮৬২২৯০১, ০১৫৫২৩৭৪৫৮৪

শুভেচ্ছা বাণী	সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম	২
সম্পাদকীয়		৩
ফ্রম গাবতলী টু মুকসুদপুর	মাহমুদ আলম সিদ্দিকি	৫
রূপসী বাংলা	মোঃ আবু জাফর	৯
মুক্তা ঝরা ব্যাবিলন	মোসাঃ উম্মে হাবিবা ইয়াসমিন	৯
যে প্রশ্নের জবাব নেই	এমদাদুল ইসলাম	১০
তোমাকেই পেতে চাই	ইয়ারুল ইসলাম	১২
নিজের ভালো	মোঃ শামসুর রহমান (মিঠু)	১২
হারিয়ে যাওয়া	সুলতানা বেগম	১৩
মাটি ও মা	মোঃ রবিউল ইসলাম (রবি)	১৪
পলিথিন	মানিক উদ্দীন	১৪
রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানের নেপথ্য কাহিনী	উম্মে সালমা ডালিয়া	১৫
তুষ্টি	এ,কে,এম, গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী	১৮
স্বপ্নের ষোল বছর	মাহবুবুর রহমান	২১
মায়ের হাসি	জেসমিন আক্তার	২২
বহুদিন পর এলাম	মোঃ মোহন	২২
স্বপ্ন ছায়া	শুভ্র দেব সাহা	২৩
একাত্তরের সোনাভান	মাহবুব আল মামুন বিপ্লব	২৫
শহীদ স্মরণে	মোঃ আসিফ খান	২৭
কাজেই সুখ	বায়জিদ মন্ডল	২৭
এক লাবনীর কথা	মুহাম্মদ সাইফুল হক	২৮
নারীর অধিকার	কবিতা আক্তার	৩২
ভালবাসা কাঁদে	তাজিমুল ইসলাম	৩২
অশরীরী	প্রদীপ কুমার দত্ত	৩৩
স্মৃতির অ্যালবামে	মোঃ নুর-আলম	৩৫
২০০৮ সালের ১৭ই নভেম্বর ভোর ০৭.০০টা	মোঃ আবুল বাশার	৩৭
I Hate সিগারেট	রাবেয়া খাতুন	৩৯
বাবা তোমাকেও ভালবাসি	এম, এম তোফাজ্জল হোসেন	৪২
ভাল লাগার গান	মোসাঃ কুলসুমা আক্তার সাথী	৪৩
Babylon Does Not Manufacture the Ready-made Garments Only	Mohammad Hasan	৪৪
Introducing Lean	AKM Shamsul Haque Shawon	৪৬
Some Thoughts Vibrate	Masud Rana	৪৮
A Piece of My Mind for You	Salma Sultana	৪৯
অপরাজিতা	জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা	৫০
ফটো অ্যালবাম	সিলভার জুবিলির বিশেষ ক'টি মুহূর্ত	৫১-৫২

পোশাকশিল্প শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক বিকাশে ব্যাবিলন গ্রুপের উদ্যোগ প্রশংসনীয়

ব্যাবিলন গ্রুপ দেশের পোশাকশিল্প খাতে একটি প্রতিষ্ঠিত নাম । এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের অর্থনীতিতে বড় অবদান রেখে চলেছে । দেশের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে এবং হাজার হাজার তরুণ-তরুণীকে জীবিকার সুযোগ করে দিয়েছে । কিন্তু একই সঙ্গে একটি সুস্থ পরিবেশে, শ্রমিক-বান্ধব আবহে এই তরুণ-তরুণীকে নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে । এই প্রতিষ্ঠানটিকে আমি যতটা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, বাণিজ্যের চাইতে মানবিক সম্পর্কে তাদের আস্থা বেশি ।

ব্যাবিলন গ্রুপ একই সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির প্রতি তাদের ভালবাসার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে । সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কার্যক্রমের একটি অংশ । প্রতি বছর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি এর কর্মী বাহিনীর মেধা ও মননের বিকাশ লাভের একটা পথ করে দিচ্ছে । আমি এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই ।

প্রতি বছর 'ব্যাবিলন কথকতা' নামে একটি উন্নতমানের সাহিত্য ম্যাগাজিনও প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে । যাতে এর কর্মী বাহিনীর লেখা প্রকাশিত হয় । এ বছরও এটি হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত ।

আমি আশা করব ব্যাবিলন গ্রুপের এই নিষ্ঠা এবং উদ্যোগ আমাদের সংস্কৃতির সেবায় নিয়োজিত থাকবে ।

শুভেচ্ছাসহ –

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

ব্যাবিলন গ্রুপের রজতজয়ন্তী উৎসবের প্রেক্ষিতে ব্যাবিলন কথকতার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের আমেজ মিলিয়ে যাবার আগেই এর নিয়মিত সংখ্যা প্রকাশের সময় এসে গেল। আশঙ্কা বেশ ছিল এতো সংক্ষিপ্ত সময়ে অনভ্যস্ত লিখিয়েরা বিশেষ সংখ্যায় লেখার ক্লান্তি কাটিয়ে নতুন লেখা লিখে উঠতে পারবেন কি না। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমার এই আশঙ্কা প্রায় ফলে যায় যায় অবস্থা। গদ্য লেখা যদি বা পাওয়া গেল কিছু - ছড়া, কবিতার তেমন দেখা নেই। ভয় হচ্ছিলো স্বাস্থ্যবান বিশেষ সংখ্যার পর এই বছরের নিয়মিত সংখ্যাটি দুর্ভিক্ষপীড়িত, খরাক্লিস্ট শীর্ণ অবয়বে কেবল এর উপস্থিতি জানাতে পারবে মাত্র। কিন্তু শামীম, মাহমুদ, সালমা সুলতানারা থাকতে তা কি করে হয়! এরা দৌড়-ঝাপ করে লেখক-লেখিকাদের দ্বারে দ্বারে ঘন ঘন কড়া নেড়ে, এমনকি বলতে গেলে তাদের হাতে কাগজ কলম গুঁজে দিয়ে জোর করে লিখতে বসিয়ে লেখার ভাড়ার সমৃদ্ধ করেছে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে - নিয়মিত সংখ্যার ক্রম কলেবর বৃদ্ধির রেকর্ড সৃষ্টি করে বের হলো এবারের সংখ্যা। তারপরও দু-চারটে প্রকাশযোগ্য লেখা পড়েই রইলো পরের সংখ্যার জন্য।

যে যে প্রত্যাশা নিয়ে ব্যাবিলন কথকতা যাত্রা শুরু করেছিল পাঁচ বছর আগে তার একটি ছিল লিখিয়ে তৈরি করা। আজ মনে হচ্ছে সে প্রত্যাশা শুধু পূরণই হয়নি - প্রাপ্তি যেন প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়েছে। এর সাথে বাড়তি পাওয়া গেছে এ রকম একটি ঘরোয়া সাহিত্য পত্রিকা সবধরণের প্রতিকূলতার মুখেও মান রক্ষা করে সময়মতো নিয়মিত পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য কুশলী এক যোদ্ধাকুল।

বিশেষ সংখ্যা (রজতজয়ন্তী) প্রকাশের নেপথে শামীম, সালমাদের পরিশ্রম ছিল তুলনাহীন। এবারের নিয়মিত সংখ্যায় ওদের লাগাতার সংশ্লিষ্টতা, উৎসাহ, অক্লান্ত মনো:সংযোগ - এসবের বর্ণনার ভাষা আমার নেই। সহকারী সম্পাদক হিসেবে শামীমুল ইসলামের সার্থক উপস্থিতি সচেতন পাঠক পাঠিকারা এবারের লেখাগুলো পড়লেই উপলব্ধি করতে পারবেন। বিশেষ করে বাংলা রচনাগুলোতে শব্দ বিন্যাস ও নির্ভুল বানানের ক্ষেত্রে ওর সজাগ দৃষ্টির ছোঁয়া চোখ এড়াবার নয়। দু'একটি রচনা সম্পাদনার ক্ষেত্রে সালমা ও মাহমুদের সৃজনশীল সহায়তা ঐ লেখাগুলোতে বাড়তি প্রাণ সঞ্চার করেছে।

ব্যাবিলন কথকতার এবারের প্রচ্ছদ অঙ্কন ও সার্বিক শিল্প নির্দেশনা বরাবরের মত ট্রেন্ডজ-এর চিফ ডিজাইনার স্বাধীন খানই করেছে। তবে ভেতরের পাতার অলঙ্করণে এবার আমরা পেয়েছি ফ্যাশন ডিজাইনার ফারহানাকে। ব্যাবিলনের মার্কেটিং বিভাগে যোগ দিতে না দিতেই ওর ঘাড়ে এই দায়িত্ব বর্তে যায়। আর সেই দায়িত্ব সে আগ্রহ নিয়েই পালন করেছে দক্ষতার সাথে।

ব্যবসা বিবেচনায় ২০১১ সাল ব্যাবিলন গ্রুপের জন্য মোটেই কোন সফল বছর নয়। বড় বড় অভূতপূর্ব ব্যবসায়িক দুর্যোগ এবার আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। নানান সংকট ও প্রতিকূলতার মরুভূমির মাঝে এক সতেজ সজীব মরুদ্যানের মত ছিল এ বছর আমাদের ২৫ বছর পূর্তির উদযাপন অনুষ্ঠানটি। গত ১০ জুন ব্যাবিলন গ্রুপের সকল শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা-পরিচালনা পর্ষদের প্রবল উৎসাহ, উদ্দীপনাসিক্তিত সক্রিয় অংশগ্রহণে রজতজয়ন্তীর এক অসাধারণ রকম সফল উদযাপন হয়েছে। দেশি-বিদেশি ক্রেতা-সরবরাহকারী, আমাদের দীর্ঘকালের কর্মসাথী ও সুহৃদ ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব, প্রাক্তন সব ব্যাবিলনিয়ানদের উৎসবমুখর অংশগ্রহণের সম্মিলিত ফল ছিল ব্যাবিলন গ্রুপের জীবনে ঐ দিনের অনন্য সাধারণ অনুষ্ঠানের মানসম্মত সার্থক আয়োজনের স্বীকৃতি অর্জন।

আজকের এই পরিসরে আমি ব্যাবিলনের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সফল রূপকারদের আবারো জানাই কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ ও প্রাণঢালা অভিনন্দন। অনুষ্ঠানে ব্যাবিলন সংগীত পরিবেশন, চোখ ধাঁধানো ফ্যাশন শো-সহ চমৎকার সাবলীল উপস্থাপনা ও অনুষ্ঠান পরিচালনার পুরো কৃতিত্ব ছিল প্রায় এককভাবে ব্যাবিলনিয়ানদের। কুশীলবদের সবার নাম উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। তবু কয়েকজনের কথা না বলে পারছি না। এরা হলো মোহাম্মদ হাসান, সাইফুল হক, মো: শাহ আলম, শামীমুল ইসলাম, সালমা সুলতানা, উম্মে সালমা ডালিয়া, প্রদীপ কুমার দত্ত, হাদিয়ার রহমান, আইটি বিভাগের হাবিব মতিউর রহমান, সাইফুল

ইসলাম, ট্রেন্ডজ-এর ইমাম উদ্দিন মো: সেলিম, মো: মহসিন আলম, স্বাধীন খান, প্রাক্তন এইচআর কর্মকর্তা রাকিব, প্রাক্তন ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস জাহান, ও আরো কতজন। ব্যাবিলনের বাইরে সংগীত প্রশিক্ষক শাওন, কোরিওগ্রাফার পলাশ ও তার সহকারী লিফা, অনুষ্ঠানের সহ-উপস্থাপিকা ফারজানা করিম, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের রাজিউল ও তার দল – এদের সবার পেশাদারি দায়িত্বের বাইরে বাড়তি কিছু করা আমাদের সবাইকে চমৎকৃত করেছে। ওদের সবার প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

সফটি (Softy) হলো ব্যাবিলনের সামাজিক দায়বদ্ধতার চলমান উদ্যোগের এ বছরের একটি ফসল। বছরের গোড়ার দিকে ব্যাবিলন কর্মীদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন উৎপাদন ও তা খুবই সুলভমূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করে ব্যাবিলন পরিবারের আমরা সবাই আনন্দিত ও তৃপ্ত। আমাদের প্রতিটি ইউনিটের ওয়েলফেয়ার অফিসারদের-কারখানা কর্মীদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরলশ উদ্যোগ প্রকল্পটির জন্য খুবই কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা রাখছে। আমাদের আশা ও বিশ্বাস ব্যাবিলনের এই প্রচেষ্টাটি দেশের অন্যান্য শ্রমঘন প্রতিষ্ঠানেও অনুসৃত হবে।

গত বিশ্বমন্দার ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই দ্বিতীয় দফার মন্দা অর্থনৈতিক বিশ্বটাকে আবার বিক্ষত করে চলেছে। আরো অনেকের মতোই ব্যাবিলনও ভালভাবে (মানে খুব মন্দভাবে) তার গা জ্বালানো উত্তাপ সহ্য করেছে ও করছে সারা বছর জুড়ে। তাই বলে এটাকে অজুহাত করে ব্যাবিলন তার প্রতিশ্রুত সমাজসেবী কর্মকান্ড থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখার কথা ভাবেনি। সফ্টির মতো প্রকল্পের পাশাপাশি ব্যাবিলন পরিচালকদের উদ্যোগে বিশেষ করে আবিদুর রহমান, নিসার আহমেদ এবং জনসংযোগ ম্যানেজার শামীমের ঘাম ঝরানো প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে হেমায়েতপুরস্থ তেঁতুলঝোড়া হাই স্কুলে ব্যাবিলন লাইব্রেরি নামে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যত্ন নিয়ে বাছাই করে কেনা বইগুলো নতুন কেনা আসবাবে শুধু দর্শনীয় বস্তু হয়ে থাকবে না – বরং তা শত শত ছাত্র-ছাত্রীর জ্ঞান পিপাসা নিবারণের সহায়ক হবে সেটাই আমাদের কাম্য।

ব্যাবিলন কথকতার পঞ্চম সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করেছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, জনপ্রিয় লেখক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। সেদিন আমাদের পত্রিকাটির জন্য তাঁর উৎসাহমূলক আশা জাগানো বক্তব্য ভুলে যাবার নয়। এবারের সংখ্যায় জনাব মনজুরুল ইসলাম তার শশব্যস্ত কর্মকান্ডের ভেতর থেকে সময় বের করে ব্যাবিলন কথকতার লেখক-লেখিকা ও কুশলীদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছেন। তাঁর ওই বক্তব্য ও আশাবাদ আমাদের পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যার মানকে আরো সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

খুঁত খুঁতে পাঠক-পাঠিকার নজরে পড়বে এবারের সংখ্যায় প্রিন্টার্স লাইনের কিছু পরিবর্তন। সেখানে গত সংখ্যার আহ্বায়কের সহ-সম্পাদকের দায়িত্বে উন্নীত হওয়াটা ও আরো কিছু নতুন মুখকে স্বাগত জানাতে জানাতে তাদেরকে একটা খারাপলাগা বোধও ছুঁয়ে যাবে ইতোমধ্যে বহুল পরিচিত মোহাম্মদ সাইফুল হক ও সোহেলী সুরাইয়া ছাদেক-এর নাম না খুঁজে পেয়ে। ব্যাবিলন কথকতার জনপ্রিয় এই দুই কুশলী ও নিদারুণ সুহৃদ তাদের পেশাগত দায়িত্বের বাড়তি চাপে প্রায় নুহ্য। তাই এরা দুজনে নতুনদেরকে জায়গা করে দিয়ে এখন তাদের পুরোটা সময় ও মেধা নিয়োজিত করেছে স্ব স্ব মূল দায়িত্বে। ওদের দুজনকেই ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা সকল পাঠক-পাঠিকা ও সম্পাদকের পক্ষ থেকে।

পরিশেষে ব্যাবিলন গ্রুপের সবাইকে এবং ব্যাবিলন কথকতার লেখক-লেখিকাসহ এর সব পাঠক-পাঠিকা ও অনুরাগীদের জানাই মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা আর আগাম ইংরেজি নববর্ষ ২০১২-এর শুভেচ্ছা। সবাই আনন্দে থাকুন ও অন্যকে আনন্দে রাখুন।

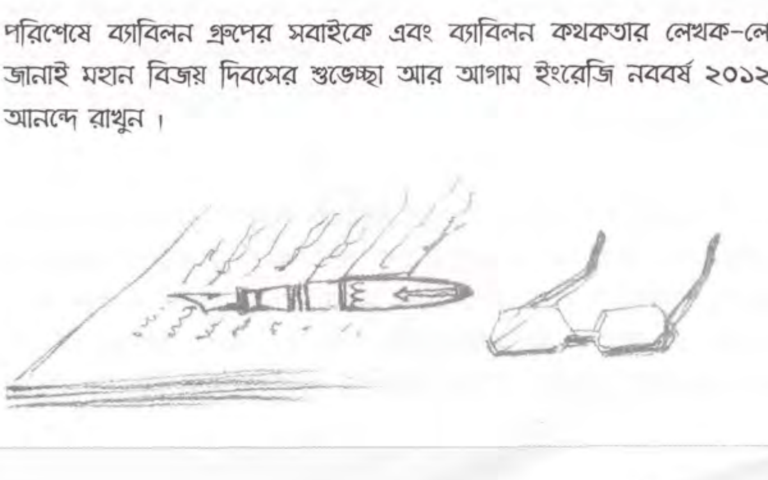

এমদাদুল ইসলাম
সম্পাদক

ডিসেম্বর ১৫, ২০১১

ফ্রম গাবতলী টু মুকসুদপুর

মাহমুদ আলম সিদ্দিকি
ডেপুটি ম্যানেজার, এইচআরডি এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ওভেন টপ্স, ব্যাবিলন গ্রুপ

গাবতলী বাসস্টযান্ডের উদ্দেশ্যে একটা রিকশাওয়ালার সাথে চুক্তি করলাম। আগাম চুক্তিটা সেরে নিতে না পারলে শেষমেষ রিকশাওয়ালাদের কাছে অপমান-অপদস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল থাকে আজকাল। ঢাকা শহরের হরেক রকম মাস্তানদের মধ্যে তিন চাকার এই ড্রাইভারদের অবস্থান মাঝেমধ্যেই এক নম্বর মনে হয় এবং ঘটনান্তরে তা কিন্তু মোটেই অমূলক নয়। এই শহরে যাদেরকে হরহামেশা রিকশায় চলাচল করতে হয় তাদের মধ্যে অতিমানব কিংবা দরাজ দিল হাতেম তাঈ ভিন্ন বেশিরভাগই আমার এই অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির সাথে একমত হবেন একথা হলফ করেই বলা চলে।

ইতিমধ্যে সকাল নয়টা বেজে গেলেও আজকের ঢাকা শহরটা পুরোপুরি অন্যরকম। বেশিরভাগ দোকানের শাটার খোলেনি এখনো। প্রচন্ড শব্দ তুলে যান্ত্রিক যানগুলো এখনো রাস্তায় নামেনি। শব-ই-বরাতের মহিমান্বিত রাতে নগরীর মানুষগুলো বিত্ত-সম্পদ, মান-মর্যাদা, স্বাস্থ্য, আভিজাত্যের ভাড়ার টইটুম্বুর করার লক্ষ্যে নফলের পর নফল নামাজ আদায় করে দীর্ঘ মোনাজাত শেষে ঘুমিয়ে পড়ে এখনো জেগে উঠেনি। আমিও চোখের পাতায় ঘুম ঘুম রেশ নিয়ে নগরের অচেনা-অনভ্যস্ত রূপের চেহারা দেখতে দেখতে গাবতলী পৌঁছে গেলাম। এই স্টেশনটার সাথে আমার যোগাযোগ বহুদিনের। গাঁয়ে ফেরার এই স্টেশনটাতে এলে হোম সিকনেসটা তীব্রতর হতে থাকে। গাবতলী বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে আজকে। অন্যান্য দিনের মতো ব্যাগ ধরে টানাটানি না থাকলেও "বরিশাল-সাকুরা-চেয়ার কোচ, চন্দ্রা-মাদারীপুর-দশটা, আজমীরী-মুকসুদপুর-কালনাঘাট, সাউদিয়া-ফরিদপুর-বোয়ালমারী, সিট খালি, বাম্পার খালি"- এ রকম হলকা চালের হাকডাক কিন্তু থেমে নেই। স্টেশনের এই ঢিলেঢালাভাব দেখে আশ্বস্ত হলাম। চোখের ঘুম ভাবটা এখনো কাটেনি। অবসন্ন অলস শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করার জন্য স্টেশনের ভেতরের একটা চা-কলা-পানি-বিস্কুটের ঝুপড়ি দোকানের টুলের উপর ব্যাগটা রেখে এক কাপ কড়া চায়ের অর্ডার দিলাম। স্টেশনের দোকানীরা স্বভাবতই খুব চটপটে হয়ে থাকে। সারি সারি চায়ের কাপ। কাপে কাপে ছাকনিটা সচল রেখে কেতলীতে গরম জল ঢালার ছন্দ-তরঙ্গ। দোকানীর তিন আঙ্গুলের নমনীয় কারু-কৌশলে দুধ-চিনি আর জল মেশানোর মিষ্টি ঝংকার। চামচের কারসাজিতে সৃষ্ট জলের ঘূর্ণন - তন্ময় হয়ে চা বানানো শিল্পে মগ্ন হয়েছিলাম। শিল্প দর্শনের এই ধ্যানভঙ্গ হলো আমার প্রায় ঘাড়ের কাছে একটা গদগদ কন্ঠের আওয়াজে। আমাদের এলাকার রাসেল। কথা বলতে বলতে পেছনের দিক থেকে ইতিমধ্যে সামনে চলে এসেছে ও।

- কাকা কেমন আছেন?
- আরে রাসেল! তোর খবর কি? কেমন আছিস তুই? তুই না আজমীরীতে ছিলি?
- হ কাকা, আমার প্রমোশন ওইছে। আজমীরীর সুপারভাইজার ওইছি কাকা। দোয়া কইরেন। এহন মোটামুটি ভালোই আছি। আপনি কি বাড়ি যাবেননি? টিগিট করছেন?
- না টিকিট এখনো করি নাই। চা-টা খেয়ে যাবো ভাবছি।
- আজমীরী তো এহন আর পাবেন না। লাস্ট টিপ চইলা গেল কিছুক্ষণ আগে। আর আছে দুইটায়। আপনার জন্য ভালো একটা টিগিট আইনা দিতাছি।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে রাসেল ভুতের মতো অদৃশ্য হয়ে গেল টিকিট আনতে। আমাদের এলাকায় যখন আজমীরী চালু হয় তখন ও এলাকার স্টেশনে- "এই আজমীরী-আজমীরী-স্লিপিং সিট, হালকা ঝাকি, নরম গদি-সিট খালি-বাম্পার খালি আজমীরী-ঢাকা-আজমীরী" বলে চিৎকার করে যাত্রী যোগানোর চাকরি করতো। তারপর আজমীরী পরিবহনের হেলপার এবং অতঃপর সুপারভাইজার। পদোন্নতির ধারাক্রম সন্তোষজনকই বলা চলে। অন্ততঃ সুপারভাইজার হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেবার

সময় ওর ঠোঁটের কোনের গর্বের হাসিটা সেই প্রমাণই দিচ্ছিলো। হেলপার থেকে ড্রাইভার না হয়ে সুপারভাইজার কেন হলো তা অবশ্য জিজ্ঞেস করা হয়নি।

আমার চা শেষ করার আগেই রাসেল একটা টিকিট হাতে নিয়ে হাজির।
– কাকা ভালো একটা টিগিট পাইছি। কমফোর্ট লাইন। চেয়ার কোচ। গাড়ির টান একশো একশো। ঘাটে (দৌলতদিয়া ফেরি ঘাট) জাম (জ্যাম) না থাকলে প'নে চার ঘন্টার বেশি লাগবে নানে। ছিদ্দিক ড্রাইভার গাড়ি না জানি পংখীরাজ চালায়। জটিল জিনিস। সুপারভাইজাররে আপনার কথা কইয়া দিছি।

রাসেলের পংখীরাজ আমার মধ্যে এক ধরনের ভয় ঢুকিয়ে দিলো। না জানি ড্রাইভার বেটা পংখীরাজটাকে পানি খাওয়ানোর জন্য রাস্তার পাশের কোন গভীর খাদে নাক ডুবিয়ে দেয়। আমি টিকিটের দামের সাথে বাড়তি পঞ্চাশ টাকা ওর হাতে গুজে দিলাম। ও টিকিটের দামটা রেখে বাকিটা আমাকে ফেরত দিলো। বললো –
– কাকা এহন সুপারভাইজার ওইছি না, এহন কি আর হেলপার আছি নাকি। দুইটার টিপে আইতাছি। সন্ধ্যায় বাজারে দেহা করবানে। একটা টাইগার খাওয়াইয়্যা দিয়েন। গাড়ির সময় ওইছে। ৯৬৩৫ নম্বর গাড়ি। মসজিদের সামনেই আছে। চলেন উঠাইয়া দিয়ে আসি।

আমি চায়ের টাকা শোধ করে ওর পিছনে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে খানিক রসিকতা করার জন্য ওকে জিজ্ঞেস করলাম–
– হ্যারে রাসেল, তোর যে প্রমোশন হলো, ওরা তোর প্রমোশন লেটার দিছে তো? না দিলে আমার অফিসে আসিস। একটা লেটার তোরে দিয়ে দেবোনে। ও সম্ভবতঃ কিছুই না বুঝে হাসলো। আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে বিদায় নিলো রাসেল।

গাড়ি ছাড়তে আর মিনিট পাঁচেকের মতো বাকি। যাত্রীরা তাদের বিক্ষিপ্ত অবস্থান থেকে একে একে গাড়িতে উঠতে শুরু করেছে। দু'একজন গাড়িতে ব্যাগ রেখে যারা ফল টল কিনতে গিয়েছিলো তারাও বেশ দ্রুতগতিতে ফিরে আসছে। গাড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দু'একজন আগামী দেড় ঘন্টার সিগারেটের তৃষ্ণা মিটানোর জন্য বেশ কষে সুখটান দিয়ে নিচ্ছে। বাসের মধ্যে মানুষ এখন আর বিড়ি সিগারেট খায় না। গত ১০–১৫ বছর ধরে বাংলাদেশের ইতিবাচক অর্জনগুলোর এইটা একটা। অনেকটা স্বতঃস্ফুর্তভাবেই এই অপকর্মটা বন্ধ হয়েছে।

সাড়ে দশটা বেজে গেছে আরো মিনিট ১৫ আগে। বাস ছাড়ার ১৫ মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও স্টাফদের কোন খবর নেই। কিছুক্ষণ আগে যে হেলপারটা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো সেও উধাও। যাত্রীরা একজন আরেকজনের সাথে সুর মিলিয়ে, কথার সাথে কথার রেশ মিশিয়ে অদৃশ্য স্টাফদের গালাগাল, ধিক্কার দিয়ে গোষ্ঠী উদ্ধার করে গায়ের জ্বালা মেটানোর চেষ্টা করছে। ততক্ষণে আরো মিনিট দশেক অতিক্রান্ত হবার পর বেশ স্বাস্থ্যবান ছিদ্দিক ড্রাইভার পান চিবোতে চিবোতে তার দুই স্টাফ (সুপারভাইজার এবং হেলপার)–কে সঙ্গে নিয়ে বেশ গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে বাসে উঠল। ড্রাইভিং সিটে বসেই চাবিটা ঘুরিয়ে বোঁ বোঁ আওয়াজ তুলে যাত্রীদের তীর্যক আক্রমণের ঝাঁজকে শব্দের মধ্যে গুলিয়ে দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে গাড়ি টানতে শুরু করলো সিদ্দিক ড্রাইভার। পংখীরাজের ড্রাইভার বলে কথা। যাত্রীদের তীর্যকবান তখনো বন্ধ হয়নি। কিন্তু গন্ডারের চামড়ায় যেখানে গুলি পিছলে যায় সেখানে সামান্য কটুকথা–এতো নস্যি।

দেরি করে বাস ছাড়ার একটা নতুন কৌশল লক্ষ্য করলাম। আধাঘন্টা সময় জালিয়াতির অভিনব কৌশল। আগের কৌশলটা একটু ভিন্ন রকম ছিলো। ড্রাইভার যথাসময়ে বাসে উঠে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ইঞ্জিনে একটা গোঁ গোঁ শব্দ তুলে দুই ফুট এগিয়ে একটু পিছিয়ে আসতো। তার কিছুক্ষণ পর আবার একই কায়দায় গাড়ি ছাড়ার একটা ভাব ভাব করে ২০/২৫ মিনিট কাটিয়ে দিতো। ছোট বেলায় তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে একটা বানরের প্রথম মিনিটে দুই মিটার উঠে পরের মিনিটে ১ মিটার নেমে যাওয়ার একটা অংক করেছিলাম। কেবলমাত্র বাস চালকগণই ওই অংকটার যথার্থ ব্যবহার করতে পেরেছে মনে হয়।

গাবতলী স্টেশন ছেড়ে আমিন বাজার ব্রিজে উঠেই বাম দিকে চোখ পড়লো। ব্রিজের সামান্য দক্ষিণে নদীর পশ্চিম পাড় ঘেঁষেই গতরাতে বিখ্যাত হয়ে উঠা কেবলার চর। চর নামের এই বালুর ঢিবি, সারি সারি মরচে পড়া ড্রেজার, আমিন বাজার ল্যান্ডিং

স্টেশনের লোহা লক্কড় আর বালু উঠা নামার কাজে ব্যবহৃত কোবেল কোর জঞ্জালের মধ্যেই গত রাতে ছয়জন তাজা তরুণকে হত্যা করা হয়েছে পাশবিক নৃশংসতায়। মহিমান্বিত রাতে বড়দেশী গ্রামের ঘরের মধ্যে ইবাদতরত মানুষগুলো, মসজিদের ধ্যানমগ্ন মুসল্লীগণ, রাস্তার পথচারী জড়ো হয়ে ইট, রড, বাঁশ, লাঠি, কিল, ঘুষি আর ল্যাং মেরে ছয় আদম সন্তানের মাথা-মুখ থেতলে দিয়ে প্রাণলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছে চরের বালুতে। নির্বিকার পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দারুণ উপভোগ করেছে সেই দৃশ্য।

দূরপাল্লার বাসগুলোতে যাত্রী মনোরঞ্জনের জন্য গান বাজানো হতো। মুঠোফোনের অত্যাচারে সেই সংস্কৃতি এখন বিলুপ্ত। এফএম রেডিও, কলাগাছ ফুলে গজিয়ে উঠা নব্য শিল্পীদের বেসুরো গান, উদ্ভট সব রিংটোন, কোন কোন ব্যক্তির উচ্চস্বরের দ্বিধাহীন পারিবারিক/ব্যবসায়িক আলাপ, কারো কারো নীচু স্বরের অবিরাম ফিসফিসানি এক ভয়ংকর শব্দ দুষণের সৃষ্টি করছে। গান বাজছে না ঝগড়া হচ্ছে, সুর না হট্টগোল, খবর নাকি ঢাকার চাকা, হিন্দি, বাংলা, আধুনিক, অনাধুনিক, ফিউশন, রিমিক্স, রিমেক, এক্সপেরিমেন্ট সব মিলেমিশে এক লাগাতার শব্দ দুষণের মুঠো সংস্কৃতিতে অনভ্যস্ত কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। "অদ্ভুত উটের পিঠে চলছে স্বদেশ।"

নবীনগর ছেড়ে আসার পর থেকেই তুমুল বৃষ্টি নামতে শুরু করলো। "দিকে দিকে সঘন গগন মত্ত প্রলাপে/প্লাবণ ঢালা শ্রাবণ ধারাপাতে/যখন বৃষ্টি নামলো।" শ্রাবণের বৃষ্টির ছটা আমার মুখের উপর জলের ঝাপটা দিয়ে যায়। শীতল পরশ বুলিয়ে যায় আমার শরীরে-অন্তরে। বৃষ্টির ঝাপটায় দুই পাশের ঘাস-বৃক্ষ-লতাগুল্ম গ্রামের নধর সবুজ প্রকৃতি ঝাপসা হয়ে অন্যরূপ ধারণ করে। দক্ষিণের বাতাসে বৃষ্টির ঝাপটায় গ্লাসটাকে আর খুলে রাখা সম্ভব হলো না। জানালাকে টেনে দিয়ে গ্লাসের মধ্যে দিয়ে শ্রাবণের রূপ-রসের যতটুকু আবছা অবয়ব দেখা যায় তাতে সন্তুষ্ট হয়ে শ্রাবণ যাত্রাকে সাধুবাদ জানালাম মনে মনে।

ইতিমধ্যে বৃষ্টির তীব্রতা দ্বিগুণ হয়ে অর্জুনের শরের মতো গাড়ির উপর আছড়ে পড়ে দ্রুতলয়ের জল-তরঙ্গের সৃষ্টি করছে। কমফোর্ট লাইনের ছাদ আর নড়বড়ে থাই গ্লাসের বিভিন্ন ছিদ্র দিয়ে অঝোর শ্রাবণ গাড়ির অনেক যাত্রীর শরীরের উপরেই বেশ বড় বড় ধারায় পড়তে শুরু করেছে। এই অনাহুত বিপত্তির শিকার যাত্রীগণ তাদের মোবাইলের বিনোদন বন্ধ করে দিয়ে প্রচন্ড হট্টগোল শুরু করলো। বাস ছাড়ার পূর্বেকার আধাঘন্টার হট্টগোল শালীনতার মধ্যে থাকলেও এ ধরনের আকস্মিক অনাচারে তা অশালীন আকার ধারণ করেছে। তেড়েফুড়ে আসা বৃষ্টি, বিপর্যস্ত মানুষ এবং তাদের লাগামহীন জিহ্বার রোষানলে বেচারা সুপারভাইজারের তখন করুণ অবস্থা। নির্বাক কাচুমাচু সুপারভাইজার শেষে উপায়ান্তর না দেখে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে অন্যপ্রান্তের উদ্দেশ্যে ফোন করলো- "আপনাদের কতবার কইছি গাড়ির ছাদে পুডিং লাগান, পুডিং লাগান। আপনাগোতো কানে ঢোকে না। অহন আইসা যাত্রী সামলান। এত গালিগালাজ আমি সহ্য করতে পারব না।" ও পাশ থেকে কি উত্তর এলো কিছু বোঝা গেল না। অন্যপ্রান্তের উদ্দেশ্যে আরো কিছুক্ষণ ঝাঁঝালো উত্তাপ ঝেড়ে বেচারা তার ফোনটি কেটে দিয়ে পকেটে পুরে অদৃশ্য কর্তৃপক্ষের দিকে ক্ষোভ ঝাড়তে ঝাড়তে গেটের কাছে গিয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

ঝড় জলের এই দেশের সর্বংসহা মানুষগুলো অর্ধশালীন-অশালীন, অমুকের বাচ্চারা তমুকের বাচ্চারা ইত্যাদি গালি পাড়তে পাড়তে কর্তৃপক্ষের চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেল। এতক্ষণে আমরা মানিকগঞ্জ ছেড়ে কালীগংগা সেতু পার হচ্ছি। শীতকালের হাঁটুজলের নদী কালীগংগা এখন বেশ তেজবান। একসময় এই কালীগংগার উদার প্রবাহ অসংখ্য বাউলের কণ্ঠস্বরে সুরের ঔদার্য সৃষ্টি করেছে। কালিগাংয়ের তীরে তীরে বিকশিত যাত্রা আর মৃত্তিকা শিল্প এখন শীতের ক্ষীণ নদীর মতোই মৃতপ্রায়। "রাই সর্ষের ক্ষেত/সকালে উজ্জল হলো/দুপুরে বিবর্ণ হয়ে গেল/তারি পাশে নদী/নদী তুমি কোন কথা কও?" জীবনানন্দের নদীগুলো শিল্পের রাসায়নিক দুষণ, অবৈধ দখলদার আর মানুষের অনাচারে আর কোন কথা বলতে পারে কিনা কে জানে।

বৃষ্টির তীব্রতা অনেকটাই কমে এসেছে। কিছুক্ষণ আগের উত্তপ্ত মানুষগুলো অনেকটাই নিরুত্তাপ। আমি গাড়ির গ্লাসটাকে সামান্য খুলে দিয়ে বাইরের দিকে চোখ গলিয়ে দিয়ে বসে আছি। হঠাৎ সমস্ত নিরবতা ভেঙ্গে হড়হড় শব্দ তুলে আমার সামনের সিটের ১২/১৩ বছরের খোকামনিটা তার পাশের জানালার গ্লাস পুরোপুরি খুলতে পারার আগেই অর্ধেকটা গ্লাসের বাইরে আর বাকিটা গ্লাস বরাবর একগাদা বমি করে দিলো। বাইরের বাতাসের ভিতরমুখী ঝাপটায় বমির ছিটে আমর মুখের উপর এসে পড়লো। একটা বীভৎস টক টক গন্ধের তীব্রতায় আমার নাকের উপর দিয়ে প্রায় সমস্ত গাড়ি আচ্ছন্ন হলো। বৃষ্টির কারণে

গ্লাসগুলো বন্ধ থাকায় ঘনীভূত আর্দ্রতার কারণে সেই গন্ধ আরো প্রকট হলো । আমি টিস্যু দিয়ে মুখটা মুছে গ্লাসটাকে আরো একটু ফাঁকা করে দিয়ে বৃষ্টির জলে মুখ বের করে দিলাম । এতক্ষণে পাটুরিয়া ঘাটে পৌঁছে গেছি । সামনে বিপুলা পদ্মা । ভরা বরষায় রাজকীয় রূপে প্রবহমান । পদ্মার সৌন্দর্যের বর্ণনা অসম্ভব । লঞ্চের ডেকে বসে বর্ষার পদ্মাকে দেখছিলাম । বহমান ঘোলা পানির পাকগুলো আলো আঁধারের প্রতিফলনে রং বদলের খেলা খেলে যাচ্ছে । দূরের রেখার মত গ্রামগুলোকে খুব অসহায় লাগছে ।

লঞ্চ থেকে দৌলতদিয়া ঘাটে নেমেই বিপত্তি ঘটলো আরেকবার । কমফোর্ট লাইনের বাসটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না । ফেরির গাড়ির দীর্ঘ রাস্তা দখল করা জটের কারণে বাসগুলো তাদের নির্ধারিত জায়গা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে কোথায় যে আস্তানা ফেলেছে তা ঠাহর করতে না পেরে উদ্বিগ্ন যাত্রীকুল হন্তদন্ত ছুটে বেড়াচ্ছিলো । এমন সময় সুপারভাইজার এসে সকলকে আশ্বস্ত করলো । সুপারভাইজারের পিছে পিছে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম । অসংখ্য বাস-ট্রাক-লরি-প্রাইভেটকারের গলি, উপগলি, তস্য গলি পেরিয়ে প্রায় মিনিট বিশেক হন্টন শেষে বাসের সন্ধান মিললো ।

যাত্রীগণ তাদের বাক্স পেটরাগুলোর ব্যবস্থা করে যার যার সিটে আসীন হয়েছেন । ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট রেখেছে । এমন সময় পিছন দিক থেকে কে যেন বলে উঠলো, "ড্রাইভার, গাড়ি ছাইড়েন না । দুইজন যাত্রী এহনও আসে নাই ।" যাত্রীর জন্য ওয়েট করার পক্ষে-বিপক্ষে তর্ক তখন উত্তেজনায় পরিণত এবং শেষে বেশীরভাগ যাত্রী যখন গাড়ি ছাড়ার পক্ষ অবলম্বন করলেন ঠিক তখনই দুই হাতে দুই জোড়া আনারস নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাতের আনারস দিয়ে ইশারা করতে করতে বাসে এসে উঠলেন দুই যাত্রী । বিরক্ত যাত্রীগণ এই বিলম্বে তাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে তীর্যক প্রশ্ন আর গা জ্বালা করা মন্তব্য শুরু করলে তারা যে উত্তর করলেন তার মানে হলো- বাড়ির জন্য আনারস কিনতে গিয়ে ভাংতি টাকা নিয়ে দোকানদারের সাথে তর্কাতর্কি উত্তেজনাই তাদের এই বিলম্বের কারণ । এতক্ষণ যে পক্ষ গাড়ি না ছাড়ার পক্ষে ছিলো তারাও তাদের এই বিলম্বের কারণ শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে সমস্বর আক্রমণে বিদ্ধ করলো বেচারাদেরকে । আর যারা গাড়ী ছাড়ার পক্ষে ছিলো, তাদের আক্রমণ অতটা তীব্র না হলেও দুই পক্ষের মিলিত আক্রমণে বেচারাদের তখন নাজুক অবস্থা । যাই হোক অবশেষে গাড়ি ছাড়লো ।

আমার সামনের সিটের যে বালক বমি করে আমার মুখ ভিজিয়ে দিয়েছিল তার বাবার অত্যধিক সন্তান বাৎসল্য আমাকে আর একবার শংকাগ্রস্ত করলো । বমি করে পেট খালি হয়ে যাওয়া ছেলেকে সতেজ করে তোলার জন্য ডিম, আমড়া, পিয়াজু, তিলের খাজা এবং পরিশেষে বেশ বড় আকারের এক জোড়া সাগর কলার সাদর পরিবেশন আমাকে পুনর্বার অম্লগন্ধময় হবার দু:সহ সম্ভাবনার কথা মনে করিয়ে দিল ।

দু'পাশের বিচিত্র সবুজের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে দিয়েছি । সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকলে নাকি দৃষ্টি শক্তির উন্নতি ঘটে । এই ছোট্ট ভ্রমণে ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া বিপত্তিগুলোর রেশ থেকে দূরে থাকার জন্য প্রকৃতির ভেতরে মগ্ন হয়ে থাকাই ভাল । কিন্তু ১৬ কোটি মানুষের দেশে তা কি আদৌ সম্ভব? গোয়ালন্দ মোড়ে গিয়েই নতুন করে শুরু হলো বিবাদ । সুপারভাইজার সাহেব গাড়ি থামিয়ে জনাকয়েক যাত্রী তোলাতেই যত বিপত্তি । ঢাকা থেকে আসা যাত্রীগণই বা সহ্য করবেন কেন? অনাহুত নতুন যাত্রীগণ নির্বিকার । সুপারভাইজার ও যাত্রীদের মাঝে তুমুল বিতন্ডা । এ ধরণের ঝগড়া বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না । নিরুপায় যাত্রীগণ এক সময় চুপ হয়ে যায় । শুরু হয় আরেক বিপত্তি । নবাগত যাত্রীগণ ও সুপারভাইজারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ঝগড়া । ভাড়া নিয়ে তুমুল তর্ক চলে প্রায় মিনিট বিশেক । ফরিদপুর শহরে এসে তর্কাতর্কি আপাত: শান্ত হলেও শহর ছাড়ার পর পুনরায় চাঙ্গা হয় বিবাদ । ঝগড়া দ্বিপাক্ষিক থেকে কখনও ত্রিপক্ষীয় রূপ ধারণ করে । আমার সামনের বালকটি ঝগড়ার শব্দের মধ্যে ভিন্ন রকম আওয়াজ তুলে আরেকবার অম্লগন্ধ ছড়িয়ে দেয় । ভাগ্যিস ইতোমধ্যে তার বাবা একটা পলিথিন জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছেন ।

শ্রাবণের মৌন প্রকৃতি বেশ খানিকটা চটপটে হয়েছে । দুই পাশের সবুজের উপরে রোদের রং পড়ে অপূর্ব ঝলমল করছে প্রকৃতি, ক্ষেত-মাঠ-গ্রাম । এই চলন্ত সবুজের মধ্যে চোখ গুজে দিয়ে একসময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সম্ভবতঃ ঘুমিয়ে পড়লাম আমি । --- ------ প্রায় ২৫ কিলোমিটারের যাত্রাশেষে তন্দ্রা ভাঙলো আমার ।

এই মুকসুদপুর কলেজ মোড়, রেডি হন । হেলপারের এই ডাক খুব ক্ষীণতর হয়ে আমার আচ্ছন্ন অনুভূতিকে ছুঁয়ে গেল ।

আড়ষ্ট চোখ খুলে বাইরের দিকে তাকালাম । মুকসুদপুর এখনো ১০ মিনিটের পথ । আমার বাম দিকে 'জয় বাংলার বিল' । পানিতে দ্বীপের মত ভাসমান গ্রামগুলো । মাঠে মাঠে সবুজ ধানের নাচন । আরও এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে সম্ভবতঃ । বৃষ্টির পর রোদ উঠেছে । ধানের পাতার ডগায় বৃষ্টির ক্ষুদ্র ফোঁটাগুলো শিশির বিন্দুর মতো লেগে আছে । সেই বিন্দুর মধ্যে রোদের সোনালী রঙের বিচ্ছুরণ । জীবনের অনেক তিক্ততার মাঝেও জীবনানন্দ সম্ভবতঃ এই জন্যেই বলেছিলেন-

মাটি ও মানুষের টানে মানব জন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হতো অনুভব করে ।
এসে যে গভীরতর লাভ হলো যে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ।

রূপসী বাংলা

মোঃ আবু জাফর
অপারেটর, কারচুপি, ট্রেন্ডজ

মাতৃভূমি বাংলা আমার
নদীমাতৃক দেশ,
নদী নালা খাল ও বিলে
রূপের নাইকো শেষ ।
এই দেশেতে ছয়টি ঋতু
কাটে বড় বেশ ।
এইতো আমার জন্মভূমি
আমার বাংলাদেশ ।
আমার দেশের গ্রামের মানুষ
সরল সোজা ভাই,
অল্পতেই খুশি তারা
কষ্ট যেন নাই ।
শীত এলে গ্রামের বাড়ি
পিঠা-পুলি ভরা,
খেজুর গাছের রসের হাঁড়ি
খুশিতে আত্মহারা ।
বর্ষা এলে নদী-নালা পানিতে থৈ থৈ
ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে
মাছ ধরায় মেতে রই ।
বলবো কি আর বাংলা আমার
রূপের নাইকো শেষ ।
এইতো আমার জন্মভূমি
আমার বাংলাদেশ ।

মুক্তা ঝরা ব্যাবিলন

মোসাঃ উম্মে হাবিবা ইয়াসমিন
সহকারী অপারেটর
জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিমিটেড

ব্যাবিলন তুমি আমাদের সাজানো ফুলদানি
তুমি মোদের আঁধার জীবনে আলোর ঝলকানি ।
আমরা ছিলাম বড় একা বড় অসহায়,
তোমায় পেয়ে জীবন মোদের শান্তি খুঁজে পায় ।
কত নারীর জীবন ভাসত চোখের পানির তোড়ে,
আজকে তাদের মুখের হাসি মুক্তা হয়ে ঝরে ।
নিরাশার আশা তুমি অকূলেতে কূল,
তুমি মোদের স্বপ্ন আশা তুমি সুখের মূল ।
থাকবনা আর অন্ধকারে দেখব নয়নভরে,
ব্যাবিলন তুমি থেক পাশে আলোর প্রদীপ হয়ে ।
বন্ধু বলে ডাক দিয়েছ বাড়িয়ে দু'খানা হাত,
সকাল বেলার সূর্য তুমি জ্যোৎস্না ভরা রাত ।
স্বাধীন হল ভূবন আমার ধন্য এ জীবন ।
তুমি মোদের আশার আলো, প্রিয় ব্যাবিলন ।

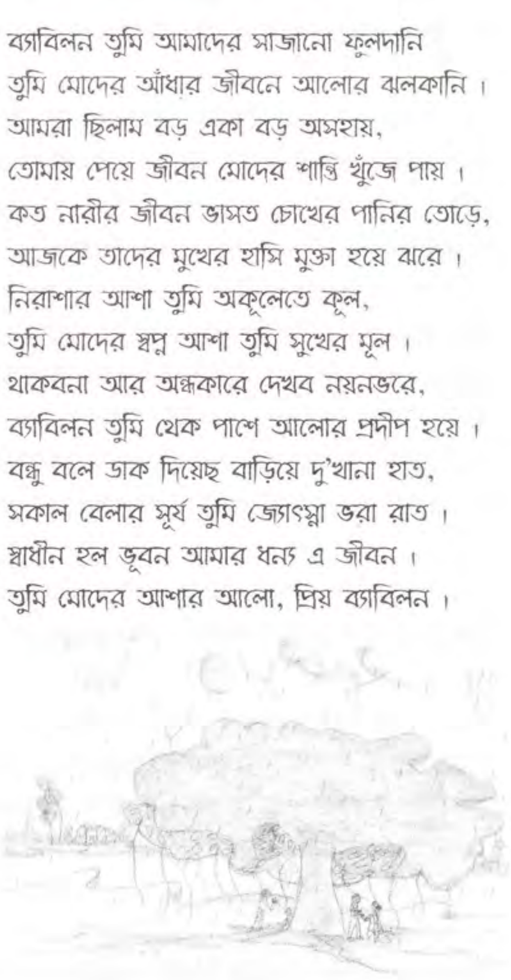

যে প্রশ্নের জবাব নেই

এমদাদুল ইসলাম
পরিচালক, ব্যাবিলন গ্রুপ

- আমি ভাল হয়ে গেছি স্যার। একদম সুস্থ।
- তাইতো দেখছি। খুব ভাল লাগলো আমার আপনাকে আবার কাজে ফিরে পেয়ে।

প্রায় ছ' সাত বছর আগের কথা। কাফ-কলার সেকশনের একজন ইন্সপেক্টর শাহ আলম দীর্ঘদিন হাসপাতালে ছিল চিকিৎসাধীন। পাকস্থলীতে জটিল এক সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাকে। অস্ত্রোপচার হয় পাকস্থলীতে। বেশ একটা লম্বা চিকিৎসাসময় কাটিয়ে সুস্থ হয়ে চাকরিতে ফিরে আসে শাহ আলম। ব্যাবিলনের মূল ভবনের তিন সেলাই ফ্লোরের কোনটিতে ও তখন কাজ করতো আজ আর তা মনে নেই আমার। তবে খুব মনে আছে আমার ওর পুনর্জীবন লাভের আনন্দে হাস্যোজ্জ্বল মুখমন্ডলে জ্বল জ্বল করা চোখ দুটো। কৃতজ্ঞতা উপচে পড়ছে সেই চোখ থেকে। ঐ দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা শাহ আলমের জন্য প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার ছিল।

ওকে সেদিন তার পুরনো জায়গায় কাজে ফেরৎ পেয়ে ভীষণ আনন্দ হয়েছিল পরিচালক সালাম স্যারের, আমার ও ওর যত সহকর্মীদের। আমাদের প্রয়াস ও শুভকামনা স্বার্থক হয়েছে ভেবেছি আমরা। অপারেশনের আগে চিকিৎসকদের শঙ্কা ছিল ওকে আদৌ বাঁচানো যাবে কিনা তাই নিয়ে। কাজেই একটা আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে ছিলাম আমরা সবাই শাহ আলমকে নিয়ে।

শাহ আলম ছাড়াও ব্যাবিলনের দীর্ঘ ইতিহাসে আরো অনেক কর্মী-কর্মকর্তার গুরুতর অসুস্থ বা দুর্ঘটনার শিকার হবার নজির রয়েছে। সবার মধ্য থেকে এই ছেলেটি আমার নজর কেড়েছে আলাদাভাবে। কেন?

শারীরিক বৈশিষ্ট্যে ছেলেটি খুবই সাধারণ। শ্যামলা রঙের মাঝারি গড়নের কোঁকড়া চুলের শাহ আলম আলাদা একটু অন্যভাবে। আমার স্মৃতিতে মুখ গোমড়া শাহ আলমের কোন ছবি নেই। চোখে-মুখে সদা হাসি-খুশি মেখে রাখাটা যেন ওর চির অভ্যাস। যদিবা কখনো মুখ হাসে না তো চোখ হাসে সর্বদাই। আমি ফ্লোরে এলে, আর ও উপস্থিত থাকলে, ওর সেই অকৃত্রিম হাসিমাখা মুখে সালাম মিস্ হয়নি কোনোবার।

এমন একটি ছেলে যখন গুরুতর অসুস্থ হল তখন মন খারাপ হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। আর তাই ওর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে কাজে প্রত্যাবর্তন ভীষণ একটা ভাললাগায় ভরিয়ে দিয়েছিল আমার মন-আমাদের সবার মন।

ভাল ছেলে শাহ আলম কাজে কর্মে সব সময়ই আন্তরিক। কাজেই সময়ের ব্যবধানে পদবী বদলে গেছে তার। জুনিয়র ম্যানেজার হয়ে কাফ-কলারের একটা বিভাগের দায়িত্বে সে।

২০১০-এর শেষের দিকের কথা। ইদানিং আগের মত ঘন ঘন প্রোডাকশন ফ্লোরে ঘুরে দেখার সময় হয় না আমার। একদিন শুনলাম সেই শাহ আলম আবার অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছে। তার নাকি অন্ত্রে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। সর্বনাশ! খবরটায় তড়িতাহত হলাম আমি। মুহূর্তে ওর হাসি-খুশি চেহারাটা ভেসে উঠল আমার মানসপটে। শেষ যখন দেখেছিলাম ওকে তখন লক্ষ্য করেছি চুলে একটু পাক ধরেছে। এর মধ্যে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। সন্তানের বাবাও হয়েছে। মনটা যারপরনাই খারাপ হয়ে গেল।

চিকিৎসার খরচে সহায়তা করছি আমরা - খোঁজ খবর রাখা হচ্ছে নিয়মিত। এর বেশ কিছুদিন পর চমকে যাওয়ার মত

খবরটা শুনলাম। শাহ আলম ছাড়া পেয়েছে। সে সুস্থ। কাজেও যোগ দিয়েছে। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। সত্যি ও সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে মরণব্যাধি ক্যান্সারের হাত থেকে?

আবারো দেখা হল শাহ আলমের সাথে ফ্লোরে। সেই চির পরিচিত হাসিটি চোখে-মুখে লটকে দৌড়ে এলো আমার কাছে। শীর্ণকায় হয়েছে। তাছাড়া সুস্থই সে।

– কি সৌভাগ্য আমাদের। ফিরে আসতে পারলেন আবার।
– জ্বি স্যার। ডাক্তারের আগের রিপোর্ট ভুল ছিল। ভুল রিপোর্ট দেখে তারা বলেছিল আমার ক্যান্সার। আসলে তা না।
– যাক বাবা। আমরাতো সবাই কি যে ভয় পেয়ে গেছিলাম। শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আর যেন অসুস্থ হয়েন না।
– জ্বি স্যার।

দারুন এক ভাললাগা নিয়ে চলে আসি নিজ দপ্তরে। ভাবি – ডাক্তারদের ভুল ডায়াগনসিসের জন্য লম্বা একটা সময় ছেলেটা, তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন অকারণে কি মানসিক কষ্টটাই না ভোগ করল এতদিন। যাহোক তাও ভালো যে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়নি। ও ভাল হয়ে গেছে। সব ভালো, যার শেষ ভালো। সালাম সাহেবসহ অন্যসব পরিচালকরাও ভীষণ খুশি (এত দিনে শাহ আলম অনেকের কাছেই পরিচিত হয়ে গেছে) তার এই বিরল সৌভাগ্যে। সুস্থ ও কর্মরত শাহ আলমের কথা আলাদাভাবে আর মনে থাকল না এক সময়।

****

– শাহ আলম তো আবারো অসুস্থ স্যার। ওর আগের রিপোর্টটাই নাকি ঠিক ছিল। পরেরটা ভুল। ওর ক্যান্সার আর সেটা ছড়িয়ে গেছে স্যার।

কথাগুলো আমার মর্মে পৌঁছার আগে যেন শূন্যে ঝুলে রইল অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় তা শেলের মত এসে বুকে বিদ্ধ হল আমার। আকস্মিকতায় এতটাই বিহ্বল হয়ে গেলাম যে একটু পরেই আর মনে করতে পারলাম না এইচআর বিভাগের কোন্ ভগ্নদূত আমাকে এই মর্মান্তিক খবরটি দিয়ে গেল।

শাহ আলম এখন সত্যিই মৃত্যুর প্রহর গুনছে। কাজ করা দূরে থাক শরীরে চলার ক্ষমতা অবশিষ্ট নেই তার। আমরাও মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছি কবে আসে সেই চরম মুহূর্তটি। বাড়ি চলে যাবার আগে দেখা করে বিদায় নিয়ে গেল সে সবার কাছ থেকে। কংকালসার শরীরে কোটরে ঢুকে যাওয়া চোখ দুটোতেই শুধু পুরোনো শাহ আলমকে খুঁজে পাওয়া যায়। ক্ষয়িষ্ণু দেহে, পান্ডুর মুখমন্ডলে ওর চোখদুটো বিস্ফারিত দুটো তারার মতই জ্বলছিল। আমরা পার্টনাররা কেউ কোন ভাষা খুঁজে পাইনি। ওর সামনে নিজেদেরকে যেন অপরাধীই মনে হচ্ছিল। আমাদের চেয়ে বয়সে ঢের নবীন হওয়া সত্ত্বেও ওকে অনেক আগেই এই সংসার থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। অথচ আমরা হয়তো এরপরও বেঁচে থাকব অনেকদিন।

নিরীহ শাহ আলমের এই পরিণতি হতে হলো কেন? কেন ভুগবে তার স্ত্রী ও শিশু সন্তান? কঠিন এক প্রশ্ন – যার উত্তর হয়তো কারোই জানা নেই।

দন্ডপ্রাপ্ত একজন ফাঁসির আসামির জন্যও অনেক সময় আমাদের মনটা নরম হয়ে যায়। অন্ধকার জেল প্রকোষ্ঠে মানুষটা যখন জীবনের শেষ ঘন্টাটি বাজার অপেক্ষায় থাকে তখন কেমন হয় তার মনের অবস্থা? সেটা ভাবতে খারাপই লাগে। মায়াও হয় একটু বেচারার জন্য। তা সত্ত্বেও অন্য আরেকটা নিরপরাধ জীবন সংহারীর এই দন্ডে শেষমেষ আমরা তাও যথার্থতা খুঁজে পাই। খারাপ লাগাটা ফিকে হয়ে আসে এক সময়।

কিন্তু শাহ আলমরা যখন বিনা অপরাধে মৃত্যুদন্ড পেয়ে যায় – সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন গুনতে থাকে, অকাল মৃত্যুটাকে যখন

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে দেখে – বুঝতে পারে প্রিয়তমা স্ত্রী, প্রিয় শিশু সন্তান, বাবা-মা, প্রাণ-বৈচিত্র্য ও রূপ-সুষমায় ভরা চিরচেনা এই প্রিয় জগতটাকে সে আর বেশিদিন দেখবেনা – কেমন লাগে তার তখন? বসন্তের বর্ণিল শোভা, পাখ-পাখালির প্রভাত সংগীত, শ্রাবণের জল-তরঙ্গ, শীতের কুয়াশার চাদরে মোড়া রহস্যময় প্রকৃতি, নববর্ষের উন্মাদনা, ঈদোৎসবের আনন্দ ভাগাভাগি – এ সব কিছুর উপরই চির-পর্দা নেমে আসছে তার জন্য। জীবনের এই ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়না কি – আহা আরেকটিবার যদি সুযোগ মিলতো তো জমিয়ে রাখা দরকারি কিছু কাজ সেরে যেতে পারতাম! আমার সময় যে অকালে শেষ হয়ে যাবে তা যদি বুঝতাম তো পৃথিবীটাকে, আশেপাশের প্রিয় মানুষগুলোকে আরেকটু বেশি করে ভালবাসতাম। স্ত্রী-সন্তান, বাবা-মা, বন্ধুদের জন্য কত পরিকল্পনাই না ছিলো মাথায়। পরে করবো বলে ফেলে রেখেছিলাম। হলো না – কিছুই আর করা হল না। অনেক সাধ, অনেক স্বপ্ন, অনেক ইচ্ছে অপূর্ণ রেখেই আগাম চলে যেতে হচ্ছে।

আমি ভাবি আহা আবার যদি আচমকা কেউ এসে বলতো – আগের সব ভুল। শাহ আলমের কিছু হয়নি। ও ভাল আছে। শিগগিরই ফিরে আসছে কাজে। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ভাবি এমন অলৌকিক একটা কিছু কি সত্যিই ঘটা সম্ভব নয়?

****

অলৌকিক কিছুই ঘটল না। ফাঁসির দড়ি ছিড়ে গেল না – ঘাতকের বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লনা – শাহ আলম তার ললাটের লিখা খন্ডাতে পারল না। নিষ্ঠুর বাস্তবতা শাহ আলমকে তার অভ্যস্ত পৃথিবী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে। চির রহস্যে মোড়া অজানা অসীম এক মহাশূন্যে ডানা মেলে দিল শাহ আলমের আত্মা। ওর এই চূড়ান্ত যাত্রা শুভ হোক।

তোমাকেই পেতে চাই

ইয়ারুল ইসলাম
কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, ফিনিশিং
সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড

আমি তোমাকে পেতে চাই সদা
আমার হৃদয়ের অতল গহ্বরে,
যেতে দিবনা আমার ভূবন ছেড়ে।
আমার স্বপ্নের আলোর প্রভাবটুকু
– কে দিবে চিনায়ে?

সে শুধু তুমি, আমি তোমাকেই চিনি
এবং আমি তোমাকেই খুঁজি।
কামনার ঝর্না বেয়ে বিজয়ের রথে চড়ে
আমি তোমার সীমানায় পৌঁছাতে চাই।
আমি ভাঙতে চাই সমস্ত বাধার দেয়াল।

নিজের ভালো

মোঃ শামসুর রহমান (মিঠু)
জুনিয়র সুপারভাইজার, নিটিং
অবনী টেক্সটাইল্স লিমিটেড

সাবধানে করবো কাজ রঙ কেমিক্যাল নিয়ে,
হ্যান্ড গ্লাভ্স পরবো সবাই কাজ করতে গিয়ে।
সাবধানের মার নেই যদি মোরা ভাবি,
দরকারী জিনিসগুলো সংগে মোরা রাখি।
নিটিং-এর ডাস্ট পেটে গেলে নানা অসুখ হয়,
মাস্ক থাকলে নাকে মুখে নেইকো কোন ভয়।
মেশিন চললে ইয়ার প্লাগ পরবো মোরা ভাই,
নিজের ভালোর নিশ্চয়তা নিজেরই দেয়া চাই।
WPC আছেরে সাথে নেইকো মোদের ভয়,
সাবধানে কাজ করবি যদি দুঃখ নাহি রয়।
ব্যাবিলনের নাম করবো সবে একমতে কাজ করে,
সবাই মিলে এগিয়ে যাবো আলোর পথটি ধরে।

হারিয়ে যাওয়া

সুলতানা বেগম
পলিপ্যাকার, ব্যবিলন আউটফিট লিমিটেড

চাঁদনি রাতে আবছা মৃদু হাওয়ায় পুতুল তার সাথীদের নিয়ে বস্তির চাপাগলির মধ্যে খেলছে। হঠাৎ পুতুলের মনে পড়ল তার মা নিশ্চয়ই তার জন্য খাবার নিয়ে বসে আছে। ও ... পুতুল কে? সেটাইতো বলা হয়নি, এই পুতুল কোন খেলার পুতুল নয়। এই পুতুল হলো বিধাতার নিজের হাতে গড়া এক অপূর্ব জ্যোতি। পুতুল আর এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটে গেল তার মায়ের কাছে। কিন্তু একি! আজ মা পুতুলের জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে না। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। পুতুলের মা মাঝে মাঝে এইভাবে মেয়েকে লুকিয়ে নীরবে চোখের জল ফেলে। তবে পুতুল কখনো তার মায়ের কান্নার কারণ জানতে চায় না। কারণ একবার এই বস্তির সবচেয়ে মুরুব্বি করিম দাদুর কাছ থেকে তার মায়ের দুঃখের কথা কিছুটা শুনেছিল। করিম দাদু পুতুলকে বলেছিল–

পুতুলের বাবা-মার ছোট সংসার ছিল। কিন্তু হঠাৎ পুতুলের বাবা যে কারখানায় কাজ করতো সেটা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সংসারে নেমে আসে অভাবের কালো ছায়া। কাজের সন্ধানে পুতুলের বাবা চট্টগ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পুতুলের মা অবশ্য স্বামীর সিদ্ধান্তে খুব বেশি রাজি ছিল না। কেননা তখন পুতুল ছিল তার মায়ের গর্ভে। শেষে মা অনাগত সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্বামীর সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিল।

স্বামীকে বিদায় দেওয়ার সময় পুতুলের মা শুধু একটা কথাই বলেছিল - 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো'। স্বামীর পথ চেয়ে পুতুলের মায়ের দিন কাটতে লাগল। কিন্তু দিন যায় মাস যায়। বছর পেরিয়ে গেল। তবু পুতুলের বাবা ফিরে এলো না। অনেক চেষ্টার পরও পুতুলের মা স্বামীর কোন খোঁজ পেল না।

এরই মধ্যে পুতুলের মায়ের কোল আলো করে এলো পুতুল। নিজের ও সন্তানের খাবার জোগাড় করা, অনেক কষ্ট বেড়ে গেল। উপায় না পেয়ে পুতুলের মা একবার আত্মহত্যা করতে যায়। কিন্তু ফুলের মতো মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। এর পর ভাগ্যক্রমে করিম দাদুর সাথে দেখা হলো পুতুলের মায়ের। তারপর থেকে তার দয়ায় পুতুল আর ওর মায়ের ঠিকানা এই ফুলবাড়ীর বস্তি। এরপর করিম দাদু একটি গার্মেন্টসে পুতুলের মায়ের কাজ জোগাড় করে দিয়েছে। এ সব ভাবতে ভাবতে পুতুলের অনেক সময় কেটে গেল। সত্যি কথা বলতে পুতুল ওর মাকে খুবই ভালোবাসে। কেননা এই হতভাগী মা ছাড়া পৃথিবীতে আপন বলতে ওর আর কেউ নেই। ছোট পুতুল সব সময় ভাবে কি করে সে বড় হয়ে ভাল করে লেখা-পড়া করে ওর মাকে একটু সুখের মুখ দেখাবে। ওর দু'চোখ জুড়ে শুধু ওর মায়ের সুখের জীবনের স্বপ্ন। এবার স্বপ্নের জাল ভেদ করে পুতুল গিয়ে ওর মাকে জড়িয়ে ধরল। মাও পুতুলকে জড়িয়ে ধরল। এরপর দু'জনে রাতের খাবার খেতে বসল। মা ভাত মেখে পুতুলের মুখে তুলে দিতে দিতে হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা পুতুল আমি যদি কখনো হারিয়ে যাই...? মায়ের কথা শেষ না হতেই সে মায়ের মুখ চেপে ধরে বলল, তাহলে আমিও হারিয়ে যাব। পরের দিন সকালে পাটকাঠির বেড়ার ফাঁক গলে সূর্যের আলো প্রবেশ করেছে ঘরের মধ্যে। পুতুলের মা তাড়াতাড়ি উঠে পুতুলকে স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি করল। মা পুতুলের হাত ধরে ঘর থেকে বের হলো। পুতুলতো অবাক, আজ হঠাৎ মা কাজে না গিয়ে তাকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে।

মা বললো আজ আমার অর্ধেক দিন কাজ, আজ আমি আমার পুতুল মাকে স্কুলে দিয়ে তারপর কাজে যাব। খুশিতে পুতুল তার মাকে জড়িয়ে ধরল। স্কুলের সামনে এসে পুতুল হাত নেড়ে তার মাকে বিদায় জানালো। তারপর কিছুক্ষণ অপলকে মায়ের

চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। বিকালে পুতুল স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এলো, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, তবু মা ঘরে ফিরে এলো না। পুতুল যথারীতি বাড়ির পাশে সেই মাঠটাতে বসে মায়ের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে, যেখানে প্রতিদিন বিকাল বেলায় মায়ের ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে থাকে। আর তারপর মায়ের হাত ধরে ঘরে ফেরে। হঠাৎ করিম দাদু এসে পুতুলের হাত দু'টি চেপে ধরল এবং ওর দিকে কিছুক্ষণ ভেজা চোখে তাকিয়ে রইল।

তারপর দাদু পুতুলের হাত ধরে বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে পুতুল দেখল অনেক মানুষের ভীড়। আর মাঝে কাফন জড়ানো একটি লাশ। পুতুলের কানে ভেসে আসলো – এইতো দুপুর বেলায় মেয়েটা কাজে গেল। কে জানত গার্মেন্টসে লাগা আগুনে ওকে প্রাণ দিতে হবে। পুতুলকে দেখে আরও একজন বলে উঠল, হায় আল্লা এই এতিম মেয়েটার এখন কি হবে? পুতুলের আর বুঝতে বাকি রইল না কাফনের নিচে লাশটা কার। এবার পুতুল দৌড়ে গিয়ে মায়ের বুকের উপর আছড়ে পড়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। আর শুধু কয়েকটা কথাই বলল পুতুল, "মা-মাগো, তুমি আমাকে একা ফেলে যেওনা...।"

সবাই লাশ দাফনের ব্যবস্থা করল। কিন্তু পুতুলের হঠাৎ কি যেন হল। তার চোখে কোন পানি নেই। মনে হচ্ছে ওর চোখ দু'টি পাথর হয়ে গেছে। মাটির বারান্দায় বসে পুতুল আকাশের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে কি যেন ভাবছে।

একটু পরে করিম দাদু এলো কবরে মাটি দেওয়ার জন্য পুতুলকে ডাকতে। একি পুতুল কোথায়? সবাই অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পুতুলকে পেল না। দিন যায়, মাস যায়, বছর পেরিয়ে যায়, প্রকৃতির নিয়মে সূর্য ওঠে আবার ডুবেও যায়। কিন্তু পুতুল নামের এ মেয়েটিকে আর কেউ কোন দিন দেখতে পায়নি।

মাটি ও মা

মোঃ রবিউল ইসলাম (রবি)
সিনিয়র অপারেটর
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

দেশ বিদেশ ঘুরি আমি পাই না কোথাও সুখ,
সকল শান্তি দেখলে রে মা তোরেই উছল মুখ।

তোর বুকে মা ঘুমিয়ে আমি সুখের পরশ পাই,
বাংলা মায়ের মত মা যে কোথাও দেখি নাই।

যে দিক তাকাই সবুজ শ্যামল মেলেছে রঙিন ডানা,
হেথায় হোথায় মায়ের বুকে নেইকো যেতে মানা।

মাটির জন্য লড়েছি আমরা এ মাটি আমার মা,
এ মাটির রূপ রঙ্গ ছেড়ে কোথাও যাবোনা।

যুগ যুগ ধরে মায়ের জন্য করবো নিজেকে দান,
মা মাটি মানুষ আমার মাঝেই রবে চির অম্লান।

পলিথিন

মানিক উদ্দীন
কিউসিআই
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

পলিথিন, পলিথিন, পরিবেশের দুর্দিন
ডোবা নালা নর্দমা ভরে গেল দিন দিন।
পচেনা মাটিতে বা গলেনা পানিতে
পোড়ালে ক্ষতি হয় বাতাসের গুণেতে।
পরিবেশ নাশ করে দিন দিন প্রতিদিন
মহা-দানব, মহা-ঘাতক সত্যি সে পলিথিন।

রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানের নেপথ্য কাহিনী

উম্মে সালমা ডালিয়া
স্যাম্পল ও ক্যাড ইনচার্জ
ওভেন টপ্স, ব্যাবিলন গ্রুপ

গত ১০ই জুন উদযাপিত হল আমাদের মানে ব্যাবিলন গ্রুপের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠান, দেশি-বিদেশি বরেণ্য মানুষেরা উপস্থিত হয়েছিলেন সেই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে। আমার মতে আমাদের এই রজতজয়ন্তী উৎসব খুবই সাফল্যের সাথে উদযাপিত হয়েছে। এবং শুনেছি যারা ঐ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এবং যারা সময়ের অভাবে আসতে পারেননি তারাও (সম্ভবত অন্যদের কাছে জেনে) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অনুষ্ঠানটি সুন্দর হওয়ার জন্য। আমরা যারা ব্যাবিলনিয়ান তারা সবাই গত বছর থেকেই জানতাম এ বছর ব্যাবিলনের ২৫ বৎসর পূর্ণ হবে এবং এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়টাকে আরও স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমাদের অনেক কিছু পরিকল্পনা করতে হবে। এই লক্ষ্যে এ বছরের প্রথম দিকেই মাননীয় পরিচালক আবিদ স্যারের সভাপতিত্বে একটি মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত মিটিংয়ে আমারও থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। এর পরে আরও অনেকগুলো মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। কিভাবে অনুষ্ঠানটা হবে সেটা নিয়ে নানান আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে নাকি শুধু আলোচনা এবং প্রামাণ্য চিত্র দেখানো হবে সে সব নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়।

অনেকগুলো মিটিংয়ের পরে গত এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ফাইনাল সিদ্ধান্ত হয় যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। এবং সেখানে শুধুমাত্র ব্যাবিলনের নিজস্ব গানটি থাকবে এবং থাকবে ব্যাবিলনের নিজস্ব কর্মীদের উপস্থাপনায় ফ্যাশন শো। ব্যাবিলন তার নিজস্ব কর্মীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছে গত পাঁচ ছয় বছর থেকে এবং শুরু থেকেই এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সংগে আমি যুক্ত আছি। আর এই কারণেই আমাকে এই মিটিংয়ে রাখা হয়েছে। আবিদ স্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব আমাকে এবং এইচআরডি ম্যানেজার শাহ আলম সাহেবকে দেন। আবিদ স্যারের খুবই সন্দেহ ছিল আসলেই আমরা সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটা মানে গান এবং ফ্যাশন শোটা করতে পারব কিনা। স্যার সরাসরি আমাকেই বলেছিলেন 'ডালিয়া তুমি বলো তোমরা কি আসলেই পারবে, নাকি কোন বাজে পরিস্থিতিতে পড়তে হবে?' কেন যেন আমি দৃঢ়ভাবেই স্যারকে আশ্বস্ত: করেছিলাম এই বলে যে, 'ইনশাআল্লাহ্ স্যার আমরা অবশ্যই ভালোভাবে এটা করতে পারব।' তখন আমি অনেকটা ঝোঁকের মাথায় এই কথাটা বলেছিলাম। মিটিং শেষে বের হয়ে ভাবলাম আসলেই কি পারবো? ভীষণ টেনশন হচ্ছিল। কিন্তু কি করবো, বলে যখন ফেলেছি শেষটাও তো করতে হবে যথাসম্ভব সুন্দরভাবে। আমাদের বাৎসরিক প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অংশটি করার জন্য আমরা যাদের সাহায্য নিয়ে থাকি প্রথমে তাদেরকে ডাকা হলো। গানের জন্য মিঃ শাওন এবং ফ্যাশন শোর জন্য মিঃ পলাশের সঙ্গে কথা বলে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হলো। আসলে আমার ভয় করছিল কারণ আমাদের আভ্যন্তরীণ অনুষ্ঠানের দর্শক হচ্ছে বিশেষত ব্যাবিলন কর্মীবৃন্দ। কিন্তু এই অনুষ্ঠান দেখবে দেশি-বিদেশি বরেণ্য মানুষেরা। আমি বার বার পলাশ এবং শাওনকে অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আবিদ স্যার নিজেও পলাশের সাথে কথা বলেছেন যাতে কোন রকম সমস্যা তৈরি না হয়। স্যার পলাশের কাছ থেকেও অঙ্গিকার আদায় করে নিয়েছিলেন ভালভাবে অনুষ্ঠানটা শেষ করার জন্য।

যাহোক মে মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হল রিহার্সেল। গানের শিল্পী নির্বাচনে বেশি বেগ পেতে হয়নি। কারণ বাৎসরিক অনুষ্ঠানে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের মধ্য থেকেই যাচাই বাছাই করে চারজন ছেলে এবং চারজন মেয়েকে নির্বাচন করা

হলো। পরবর্তীতে ভালো করতে না পারায় দুইজন মানে একজন ছেলে একজন মেয়ে বাদ যায়। গানের রিহার্সেল-এর প্রথম সমস্যা ছিল জায়গা। ব্যাবিলন ভবনের পরিবর্ধনজনিত construction-এর কারণে আমরা এমনিতেই খুব খারাপ অবস্থায় ছিলাম, এর উপর গান করতে গেলে নীরব জায়গার দরকার তা না হলে ফ্যাক্টরি চলাকালীন সময়ে রিহার্সেল করলে অন্যদের কাজের সমস্যা হবে। প্রথমে গানের রিহার্সেলের জন্য ইন্সপেকশন রুম থেকে একটা রুম দেওয়া হয়। সেখানে চারিদিক কাঁচঘেরা কিন্তু কোন এসি ছিল না। শুধু একটা ফ্যান ছিল। দরজা লাগানোর পর ওখানে কোন মানুষ ৫ মিনিটের বেশি থাকা অসম্ভব। এভাবেই কষ্ট করে কয়েক দিন কাটানোর পর প্রদীপ স্যারের সহায়তায় অফিসারদের ডাইনিং-এ জায়গা করা হল গানের জন্য। সবচেয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে ফ্যাশন শো নিয়ে। প্রথমেই ছিল মডেল নির্বাচন। মিরপুর জোন থেকে আমি নিজেসহ কোরিওগ্রাফার পলাশ, এইচআরডির রাকিব ও জাহান মিলে ফ্লোর থেকে প্রাথমিকভাবে মডেল নির্বাচন করেছি। যেহেতু এই অনুষ্ঠানটি হবে পুরো ব্যাবিলন গ্রুপের পক্ষ থেকে তাই আমাদের অন্যান্য ইউনিটগুলো থেকেও প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত মডেলরা এসেছিল এইচআরডি সেকশনের কর্মকর্তাদের সহায়তায়। এরপর শুরু হলো এদেরকে ট্রেনিং করানো এবং এই ট্রেনিং করাতে যেয়ে অনেককেই বাদ দিতে হচ্ছিল। কিন্তু এই বাদ দেবার প্রক্রিয়ায়ও নানা জটিলতা তৈরি হচ্ছিল। এখানে আমাদের মধ্য থেকেও কারো কারো ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দে অনেককে বাদ দিতে হচ্ছিল। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মডেলদের মধ্যেও সমস্যা ছিল। যেমন নীটওয়্যার থেকে এসেছিল এক দম্পতি। তাদের মধ্যে মেয়েটি মোটামুটি ভাল করেছিল ছেলেটির থেকে। তো আমরা ছেলেটিকে বাদ দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তাতে করে মেয়েটি অনুশীলন করতে রাজি হয়নি। যার ফলে দু'জনকেই রাখতে হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরে মেয়েটি একাই চলে যায় এই ট্রেনিং থেকে। এরপর অবশ্য মডেল নির্বাচনের দায়িত্ব পুরোটাই পলাশের উপর দিয়ে দেওয়া হয়। কিছুদিন ট্রেনিং করার পরেই আমাদের মডেলদের ড্রেস নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। কিছু ড্রেস দেয় নীটওয়্যার ও বিসিএল অনুশীলনের জন্য। কিছু জিনিস মার্কেট থেকেও কিনেছিলাম। আমরা যাদেরকে মডেল নির্বাচন করেছিলাম তারা ছিল অপারেটর, হেলপার, আয়রনম্যান, অফিস বয় থেকে শুরু করে অফিসার পর্যন্ত। এই বিভিন্ন লেভেলের লোকগুলোকে সমন্বয় করা ছিল খুবই দুরুহ ব্যাপার। এদেরকে চলাফেরা, হাঁটা, খাওয়া, কথা বলা, পোশাক পরা থেকে সব কিছুই শেখানো হচ্ছিল। এগুলো সবাই একসাথে শিখতেও পারছিল না। এদেরকে শিখাতে পলাশের প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

আমাদের ট্রেনিং দেখতে পরিচালক স্যারেরাও মাঝে মাঝে তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। আবিদ স্যার তখনও অনেকটা চিন্তিত ছিলেন। আসলেই অনুষ্ঠানটি আমরা ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পারবো কিনা এই ভেবে। সত্যিকথা বলতে কি আমি আরও বেশি টেনশনে ছিলাম। কারণ আমি-ই জোর গলায় বলেছিলাম ইনশাআল্লাহ্ আমরা এটা পারবো। গানের প্রাকটিস ভালোই চলছিল। কিন্তু একটি ছেলে শিল্পীর উচ্চারণে সমস্যা হচ্ছিল। যা হোক পরে দেখা গেল মোটামুটি ঠিক হয়েছে। এদিকে অনুষ্ঠান উপস্থাপনার দায়িত্ব পান যথারীতি সাইফুল হক ভাই। কারণ আমাদের প্রায় সবধরণের অনুষ্ঠানেরই সফল উপস্থাপক হচ্ছেন সাইফুল হক ভাই। কিন্তু স্যারেরা চাচ্ছেন উনার পাশাপাশি একজন মেয়েও থাকুক। বরাবর উনার সাথে থাকে সোহেলী, কিন্তু এবার সোহেলী তার নতুন দায়িত্ব নিয়ে ভীষণ রকম ব্যস্ত থাকায় অন্য কাউকে নিয়ে ভাবতে হচ্ছিল। আবিদ স্যার চাচ্ছিলেন মিডিয়ায় কাজ করে এমন কোন মেয়েকে এ দায়িত্বটা দিতে। এদের মধ্যে জনপ্রিয় টিভি উপস্থাপিকা মুনমুন অথবা শারমিন লাকির কথা আলোচনা হচ্ছিল। মুনমুনের সাথে আলোচনাও হয়েছিল কিন্তু কোন কারণবশত: উনি আমাদের কাজটা করতে পারেননি। শেষে মিস্ ফারজানাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। উনিও টিভি উপস্থাপিকা আমার জানামতে। সাইফুল হক ভাইয়ের একটা জিনিস আমার কাছে খুবই ভালো লাগে যে, উনি ছোট বড় সব বিষয়কেই সিরিয়াসলি নেন। আর এটাতো ব্যাবিলনের এখন পর্যন্ত করা সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। তিনি একা একা রিহার্সেল করেছেন অসংখ্যবার এবং আমাদেরকে দর্শক এবং অতিথি বানিয়েও করেছেন বেশ কয়েকবার। এসবই হচ্ছে উপস্থাপনাটা অত্যন্ত ভালো হবার নেপথ্য কাহিনী।

যতই দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো আমাদের টেনশনও বাড়তে লাগলো। এছাড়া আরো নিত্য নতুন দায়িত্বও বাড়তে লাগলো। গান ও মডেলিং-এর প্রায় প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েই তাদের নানান সমস্যার কথা আমাকে জানাতে লাগলো। আর এগুলো মিটাতে

গিয়ে আমার হিমসিম খাওয়ার অবস্থা। সবচেয়ে কঠিন সমস্যায় পড়লাম অনুষ্ঠানের দিন মডেল এবং শিল্পীরা কে কি ড্রেস পরবে সেগুলো নিয়ে। এরই মধ্যে পলাশ তাকে সহযোগিতা করার জন্য একটি মেয়েকে নিয়ে আসে ট্রেনিং-এ। এরা দু'জন মিলে স্থির করে কোন্ কিউতে ছেলে-মেয়েরা কোন্ পোশাক পরবে। প্রথমে ভাবা হচ্ছিল ট্রেন্ডজ থেকেই আমরা সব পোশাক পাবো। ট্রেন্ডজ কিছু নির্বাচিত পোশাক যেমন ছেলেদের পাজামা পাঞ্জাবী, মেয়েদের স্কার্ট, টপ্স, টি সার্ট, ডেনিম প্যান্ট ইত্যাদি দিয়েছে। এছাড়াও ট্রেন্ডজ বিশেষ একটা কিউ-এর জন্য ওয়েডিং গাউন দিয়েছে ৩ পিছ। আমাদের দরকার ছিল ৫ পিছ। ১ পিছ আমি জোগাড় করেছি এবং বাকি ১ পিছ তৈরি করে দিয়েছি অনেক ঝামেলা পোহায়ে। কারণ এসব পোশাক তৈরি করতে হলে যা উপকরণ দরকার সেগুলো আমাদের কাছে ছিল না। এগুলো জোগাড় করাই ছিল ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কোরিওগ্রাফার পলাশ দায়িত্ব নিয়েছিল শাড়ি এবং সালোয়ার কামিজের। কিন্তু শেষ অবধি এসে সেও তার অপারগতার কথা জানাল। এমনিতেই অনেক কিছু কেনাকাটা করতে যেয়ে বেশ বড় রকমের টাকা খরচ করে ফেলেছি এবং যে ধরনের শাড়ি কোরিওগ্রাফার চাচ্ছে সেগুলো বেশ দামি শাড়ি। এই পর্যায়ে দফায় দফায় শাহ আলম সাহেবের সাথে মিটিং করেও কোন কূল কিনারা পাচ্ছিলাম না। শেষ অবধি বাসা থেকে শাড়ি নিয়ে আসতে হয়েছিল। প্রতিটি দিন কাটছিল উৎকণ্ঠায়। এক পর্যায়ে যখন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের সহায়তায় ফাইনাল রিহার্সেল করলাম তখন সবাই খুবই প্রশংসা করতে লাগলেন। আর আমার চাপ একটু একটু কমতে লাগলো। এছাড়াও নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছিলাম সেগুলো লিখে প্রকাশ করা সম্ভব না। মাঝে মাঝে মনটা এতই খারাপ হতো যে মনে হতো টাইম মেশিন থাকলে সময়টাকে ফরোয়ার্ড করে দিতাম।

যা হোক একদম অনুষ্ঠানের আগের দিন পুরো শিডিউল ধরে চেক করছিলাম সব কিছু ঠিক ঠাক আছে কিনা। এরই মধ্যে একজন মডেল এসে বলল ম্যাডাম আমার গাউনের উপরের ব্লাউজটাতো এখনও পাইনি। মাথা থেকে ছুটে গিয়েছিল ব্যাপারটা। আমি বজ্রাহত হয়ে পড়লাম। কারণ তখন সন্ধ্যা ৬টা বাজে, আমার সেকশন ছুটি হয়ে গেছে। কালার ম্যাচিং করে ঐ রকম কাপড়ের ব্লাউজ তৈরি করা যে কতটা কঠিন তা যারা এর সাথে জড়িত কেবল তারাই বুঝতে পারবেন। যাহোক আল্লাহ আমার সহায় ছিলেন সেদিন। চট্ করে ট্রেন্ডজ-এর একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টারকে ফোন করে ডাকলাম এবং সমস্যাটা বুঝিয়ে বললাম। ও দ্রুত চেক করে জানাল ম্যাচিং কাপড় পাওয়া গেছে এবং সে দ্রুত একটি ব্লাউজ তৈরি করে আমাকে দিয়ে গেল সন্ধ্যা ৭টার দিকে। সেদিন সবার কাজ শেষ করে রাত ৮টার দিকে বাসায় ফিরলাম। অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। দুপুর ১২টার দিকেই আমাদেরকে সেখানে পৌঁছাতে হয়েছিল সবাইকে মানে মডেল এবং শিল্পীদেরকে নিয়ে। সেখানেও ছিল ঝামেলা। মডেলরা একাধারে প্রায় ১ মাসেরও বেশি সময় ধরে অন্য রকম এক জগতে বসবাস করছিল তাই ওদেরকে বশে রাখা যাচ্ছিল না। একে দেখছি তো ও নেই এই রকম অবস্থা আর কি। এরপরেরটুকু যারা সেদিন ঐ অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন কেবল তারাই বলতে পারবেন এবং আপনারাও যারা ওখানে যেতে পারেননি তারাও এতদিনে নিশ্চই শুনেছেন কেমন হয়েছে আমাদের অনুষ্ঠানটা। আপনাদের সবার ভালো লাগাতেই আমার সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে। ধন্যবাদ সবাইকে কষ্ট করে আমার লেখাটা পড়ার জন্য।

তুষ্টি

এ,কে,এম, গোলাম মহ্‌হী চৌধুরী
সিনিয়র অফিসার, কমার্শিয়াল
ওভেন টপ্‌স, ব্যাবিলন গ্রুপ

এক

আসাদ ভাইয়ের ওপর প্রচন্ড রাগ ছিল আমাদের। বয়সে তিনি আমাদের সবার বড় অথচ বুদ্ধিতে লা-পাত্তা। গণিতে অনার্স করে বের হয়েছেন। অথচ চাকরি বাকরি যোগাতে পারেননি। প্রাইভেট টিউশনি করে দিন কাটিয়েছেন। বয়সে তিনি আমাদের চেয়ে চার পাঁচ বছরের সিনিয়র। তবু পাড়াত ভাই বলে বন্ধুর মত সম্পর্ক ছিল। তখন আমি অনার্স থার্ড কি ফাইনাল ইয়ারে পড়ি। আমার বন্ধুরাও তাই।

আমরা থাকতাম গাজীপুরের একটা ছোট্ট গ্রামে। আমাদের পাড়ার এককোনে একটা 'স' মিল ছিল। সেই মিলের মাঠে বড় বড় কাটা গাছ জমা করা হত। সেখানে বসে প্রায়ই আমরা আড্ডা দিতাম। আমি, প্রিতম, রতন, জুয়েল আর আসাদ ভাই। সবচেয়ে সরল সোজা ছিলেন বলেই আসাদ ভাইকে একটু বেশি পছন্দ করতাম। তার প্রতি আমাদের এক কথা এক দাবি–

'আসাদ ভাই একটা চাকরি যোগাড় করেন। তারপর একটা বিয়ে করেন। আমরাও আনন্দের একটা উপলক্ষ পাই।' অমনি জুয়েল নয়তো প্রিতম ফোড়ন কেটে বলত,

'আরে আসাদ ভাইয়ের আবার বিয়ে। সে পৃথিবীতে এসেছে ব্রহ্মচর্য (Sexual Abstinence) পালন করতে।'

অন্যরা হো হো করে হেসে উঠত। এভাবে আড্ডার একটা বিশেষ অংশ জুড়ে থাকত তাকে নিয়ে মজা করা। আসাদ ভাই এসব মজার জবাব দিতেন হেসে হেসে। কখনও বাকবিতন্ডায় যেতেন না। তবে আমরা তার সমস্যাগুলো যে একেবারেই বুঝতাম না, তা নয়।

আমাদের মধ্যে জুয়েল আর প্রিতম ছাড়া অন্য সবাই ছিল মধ্যবিত্ত। আসাদ ভাইদের অবস্থাটা একটু বেশিই খারাপ ছিল। তার বাবা টেইলারিং-এ কাজ করতেন। বড় তিন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি সবই খুইয়েছেন। আছে শুধু ভিটেবাড়িটুকু। ছেলেকে শিক্ষিত করতে তাদের কম কষ্ট হয়নি। এমন সিচুয়েশনে ভাল চাকরি ছাড়া বিয়ে করাতো অসম্ভব। তবু আমরা অভিযোগ দিয়ে যেতাম,

'ভাই, চেষ্টা করলে কি একটা ভাল চাকরি মেলে না। আসলে আপনি একটু বোকাই।'

অবশেষে একদিন সেই আসাদ ভাই চাকরি পেলেন। পদ হল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। বাংলাদেশের সবচে নিরীহ চাকরি। আমরা তো শুনে তাজ্জব। পৃথিবীতে কি আর কোন চাকরি নেই? শেষ পর্যন্ত প্রাইমারি শিক্ষক!

আসাদ ভাইয়ের মুখ খুশি খুশি। তিনি বললেন,

'দেখো, আমি এরকম একটা কাজ চাই যেখানে সৎ থাকা যায়। আমার মনে হয় সে কাজ আমি পেয়ে গেছি। এখন দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকাল বলে কোন ঘুষ দিতে হয়নি। সদুপায়ে চাকরি পেয়েছি, এটা যথেষ্ট।'

'আপনি খুশি?' আমরা জিজ্ঞেস করলাম।

'অবশ্যই, আমার চাহিদা কম, অল্পেই তুষ্টি। কোনরকম সৎভাবে বেঁচে থাকলেই হল।'
আসাদ ভাইয়ের এসব কথা আমাদের হাসাত। মনে হত কোন টেলিফিল্মের ডায়ালগ যেন শুনছি। কখনও কখনও বলতাম, 'পান না, তাই খান না' অর্থাৎ তিনি ভাল চাকরি পাচ্ছেন না বলেই এটাকে ভাল ভেবে আত্মতুষ্টি পেতে চাইছেন।

যাহোক, আমরা ভাবলাম তবুও তো একটা গতি হলো। এখন বিয়েশাদি করে ঘরসংসার করলেই হয়।

এরই মধ্যে হঠাৎ আমারও একটা চাকরি হয়ে গেল। বেশ ভাল চাকরি। শুধু দু'লাখ ডোনেশন দিতে হবে। ভাবলাম এ আর এমন কি। চাকরি সোনার হরিণ। চাকরিটা পেয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছিল। চাকরির পোস্টিং চিটাগাং-এ। বহুদিনের পরিচিত কাঠপট্টিতে বসে সেদিন শেষ আড্ডা হল। খুব খারাপ লাগছিল পুরানো বন্ধু, চেনা জায়গা সবকিছুকে পেছনে ফেলে যেতে। তবুও সময়ের প্রয়োজনে চলে যেতে হল। বাবা-মাকে নিয়ে চলে গেলাম চিটাগাং। যাবার আগে আসাদ ভাইকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম অনেকটা তীর্যকভাবে।

'আসাদ ভাই, আসলেই কি আপনার চাকরিতে আপনি খুশি?' কেন এ প্রশ্ন করলাম কে জানে।

তিনি বোকা বোকা হেসে বললেন,

'বিলকুল।'

মনে মনে ভাবলাম এই লোকটা সরল কিন্তু এর হাসিতে একটা চাতুর্য আছে যা সব উপহাস আর সংশয়কে এড়িয়ে যায়।

দুই

আমি চিটাগাং চলে যাবার পর কারও সাথে আর যোগাযোগ রক্ষা করা হয়নি। মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়ায় সবার নাম্বারই হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রচন্ড ব্যস্ততার মধ্যে সময়ও হয়নি কাউকে স্মরণ করার। এভাবে পেরিয়ে গেল পাঁচ পাঁচটা বছর। আমি চাকরিতে বেশ ভালই করছিলাম। চিটাগাং শহরে এক টুকরো জমি কিনে ছোটখাট একটা বাড়ি বানিয়েছি। এক কথায় established বলা চলে।

বাবা-মা বিয়ের জন্য চাপাচাপি করতে লাগলেন, বেশ ঘটা করে পাত্রীও দেখতে শুরু করলেন। বিয়ের কথা ভাবতেই সেই পুরোনো বন্ধুদের কথা বারবার মনে হতে লাগল। বারবার মন ছুটছিল সেই কাঠপট্টি, বন্ধুদের আড্ডা আর পুরোনো স্মৃতিতে। কেমন আছে সেই পুরোনো বন্ধুরা? শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম গাজীপুর যাব। ওদের খবরাখবর নেয়া হবে বিয়ের কার্ডও দেয়া হবে। পরদিনই রওয়ানা হলাম।

গাজীপুরের কোন কিছুতেই আগের মত মিল পেলাম না। কাঠপট্টি এখন আর কাঠপট্টি নেই। সেখানে হাইরাইজ বিল্ডিং উঠেছে। অনেক ঘোরাঘুরি করেও কাউকে খুঁজে পেলাম না। আসাদ ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে তারা কেউ নেই। অথচ এটা তাদের নিজস্ব বাড়ি ছিল। জরাজীর্ণ বাড়িটার চেহারাও বদলেছে বেশ। বাড়ির লোকেরা আসাদ ভাই সম্পর্কে কিছু বলতে পারল না। অবশেষে নিরাশ হয়ে ফিরবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

বাসস্ট্যান্ড এসে একটা ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকলাম "আল মদিনা ফুড গার্ডেন"। ফুলের, ফলের বাগান হয় শুনেছি। খাবারেরও বাগান হয়!

শপের ক্যাশে মোটাসোটা এক লোক বসে চেঁচামেচি করছে কি নিয়ে যেন। আমি এগিয়ে গেলাম। আচমকা চিৎকার দিয়ে বলে উঠলাম,

'তুই জুয়েল না?' আমার প্রশ্ন শুনে লোকটা ভড়কে গেল। পরক্ষণেই এক লাফে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

'আরে দোস্ত তুই? এতদিন পর কোথথেইকা?'

অনেক কথা হল জুয়েলের সাথে। অনেক স্মৃতিচারণ। জানলাম ও ব্যবসা করছে। ফাস্টফুডের বিশাল ব্যবসা। এ দোকানটা ছাড়াও ওর মৌচাক আর সফিপুরে আরও দুইটা ফাস্টফুড শপ আছে। কথায় কথায় আসাদ ভাইয়ের কথা উঠল। কেমন আছেন আসাদ ভাই।

'মোটেও ভাল না,' জুয়েল বলল। 'হুট করে চাকরিটা ছেড়ে দিল।'

'বলিস কি, চাকরি ছাড়ল কেন?'

'সে অনেক কথা। সোজা মানুষতো, তেড়া কাজে যেতে পারে নাই। সরকার প্রাইমারি স্কুলে সবাইকে বিনামূল্যে বই দেয়। সেই বই টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে স্কুল কমিটি। তারই সিকিভাগ পেত শিক্ষকরা। তিনি সে টাকা নেন নাই। প্রতিবাদ করলেন কমিটির সামনে। ব্যাস্ কমিটির কোপানলে পড়লেন। হয় সবার মতো কমিশন খেয়ে নীরব থাকো নয়তো হুমকি। শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে দিলেন।'

'বাড়ি বিক্রি করলেন কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তার বাবার ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। চিকিৎসার খরচ যোগাতে বাড়ি বিক্রি গেছে। শেষ পর্যন্ত বাপও বাঁচল না।'

'বিয়েশাদি কিছু করেছেন?'

'এত ঝামেলার মধ্যে সেই সুযোগ আর হয় নাই।'

'এখন কোথায় আসাদ ভাই?'

'আমবাগ ছোট একটা কোচিং সেন্টার খুলেছেন নিজের চেষ্টায়। একাই পড়ান সেখানে।'

চলে গেলাম আমবাগ জুয়েলকে সাথে নিয়ে। দেখলাম, প্রকান্ড একটা আম গাছের নিচে ছোট একটা ছাপড়া। সেটাই কোচিং সেন্টার। কোন সাইনবোর্ড নেই, কোন বিজ্ঞাপন নেই। কেবল ছাপড়ার ভেতর একদল ছাত্র নিয়ে বসে আছে চুল আধাপাকা এক লোক। ইনিই আসাদ ভাই। এ ক'দিনে অনেক বুড়িয়ে গেছেন। তবুও সরল সোজা মানুষটার মুখের কোনে একটা হাসি আছে। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরলেন। তাকে দেখে খুব খারাপ লাগছিল। বললাম,

'কেমন আছেন আসাদ ভাই?'

'খুব ভাল'।

দ্রুত উত্তর দিলেন। সংগে হাসি। চাতুর্যময় সেই হাসি।

স্বপ্নের ষোল বছর

মাহবুবুর রহমান
ডেপুটি ম্যানেজার, ফিনিশিং
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

মানুষ নিরন্তর স্বপ্নচারী। সময়ের মতো স্বপ্নগুলোও বয়ে চলে মানুষের জীবনের সাথে সাথে। ৪ এপ্রিল ২০১১ স্বপ্নের ষোল বছর পার হয়ে গেল। ব্যাবিলন গ্রুপের সাথে ১৬ বছর ধরে আমি হাত ধরাধরি করে চলছি।

ছেলেবেলায় আমি ছিলাম ভীষণ ডানপিটে। আমার দুষ্টুমিতে নাকি আগুন জ্বলতো। একেবারে ছেলেবেলার কথা আমার খুব বেশি মনে পড়ে না। তবে যখন থেকে বুঝতে শিখেছি, আমার মনে পড়ে আমাদের আটজনের সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ছিলেন আমার বাবা। বিশাল এ সংসারের ভার তিনি স্বচ্ছলভাবে বহন করতে পারেননি কখনোই। সীমাহীন দারিদ্রের মধ্য দিয়ে চলছিলো আমার কৈশোর। রংপুর সদর ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সরকারী কোয়ার্টারে থাকতাম আমরা। ঐ কোয়ার্টারের পুকুর পাড়ে জমতো আড্ডা। মার্বেল খেলা, ডাংগুলি, তাস, প্রতিবেশীর গাছের ফল চুরি, সংসারের জিনিসপত্র চুরি, চুরির টাকায় সিনেমা দেখে রাত করে বাড়ি ফেরা আমার প্রতিদিনের অভ্যাস হয়ে ওঠে। একদিকে দারিদ্র অন্যদিকে দুষ্টুমির কারণে বাবা-মায়ের হাতে প্রায়ই মার খেতে হতো আমাকে। এতে আমার দুষ্টুমিতে বিন্দুমাত্রও ভাটা পড়তো না। কৈশোর পেরোনোর আগেই একটা মেয়ের প্রেমে পড়লাম। প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে অবশেষে কাউকে কিছু না জানিয়ে বিয়েই করে ফেললাম আমার প্রেমিকাকে। কিন্তু পরিণতি হলো ভয়ংকর। লাইলী এবং মজনু দুজনেরই নির্বাসন হলো। অন্ধকার নেমে এলো দুজনের জীবনে। একটু আশার আলো জ্বাললেন আমার খালা শাশুড়ি। ভাগ্নিকে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে আমাকে বললেন কিছু একটা করার জন্য। কিন্তু আমি কি করবো ভেবে না পেয়ে একটা বাড়িতে লজিং নিলাম। এভাবে কাটলো প্রায় বছর খানেক। শুধু নিজের পেট চালাচ্ছি। এদিকে খালা শাশুড়িও আর পারছিলেন না। আমাকে বললেন, "বাবা তুমি ওকে এবার নিজের কাছে নিয়ে যাও।"

কোন উপায় না পেয়ে আমি তাকে নিয়ে উঠলাম এরশাদ সরকারের বাস্তহারার এক বাড়িতে। একটা ভিডিও ক্যাসেটের দোকানে ৬০০ টাকা বেতনের চাকরি নিলাম। সকাল সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাজ করতে হতো। এভাবেই বছর দেড়েক গেলো। ঘরছাড়া হবার পর এই আড়াই বছরে আমার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন কেউ কোন খবর নেয়নি। দুবেলা কখনো ভরপেট কখনো আধাপেট খেয়ে জীবন চলেছে আমাদের। শাকপাতা, মোটা ভাত ছাড়া কবে ভাল কিছু খেয়েছি মনেও পড়েনা। এক বা দুই পিস বিস্কুট সাথে দুই গ্লাস পানি - এই ছিলো আমার দুপুরের আহার। এ রকম দৈন্য-দারিদ্রের মধ্যে আমাদের ঘর আলো করে জন্ম নিল আমাদের প্রথম সন্তান। নতুন সদস্য নিয়ে আমাদের জীবন ধারণ আরো কঠিন হয়ে গেলো। মাস খানেকের মধ্যে আমার মা আমাদের নিয়ে এলেন। আমি কিছুটা স্বস্তি পেলাম। আমি একটা কাজের জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কোন কাজ জুটলো না। বাবা একাই বা কত করবেন? এদিকে মাও রাগারাগি করতে লাগলেন। কাজ জোগাড় করতে না পারলে রিকশা চালাও। অন্তত ৫০ টাকা হলেও রোজগার কর। ভাগ্যের নির্মমতার কাছে আমি হেরেই যাচ্ছিলাম। নিজের উপর ঘৃণা ধরে যাচ্ছিলো। কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। আমার বড় ভাই সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো। সে আমাকে বললো ঢাকায় চলে আসার জন্য। কোন গার্মেন্টস-এ চাকরির ব্যবস্থা করবে বললো।

স্ত্রী-পুত্রকে রেখে আমি ঢাকায় চলে এলাম। আমার বড় ভাই তার বন্ধুর সাহায্যে ফ্রেন্ডস গার্মেন্টস-এ একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। মিরপুর ১১ নং সেক্টরে আমার ফ্যাক্টরি ছিলো। চাকরির ৬ মাসের মাথায় শ্রমিক অসন্তোষের কারণে ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেল। অন্যান্য ওয়ার্কারদের কাছে ব্যাবিলন-এর সুনামের কথা জানতে পেরে পহেলা এপ্রিল ১৯৯৫ সকালে ব্যাবিলন গেটে গেলাম। কিন্তু ৭০০ টাকা বেতন শুনে কাজে যোগ না দিয়ে চলে আসি। আমার ভাড়াবাসার মালিক অফিসে যাই না দেখে জিজ্ঞেস করলেন- "তুমি অফিসে যাচ্ছো না কেন?" আমি কারণ জানালাম। তিনি বললেন - "ফ্যাক্টরিটা ভালো। আমার বাসায় ব্যাবিলনের একটা ভাড়াটিয়া ছিলো। সে ঠিকমতো বেতন পেতো। প্রতি মাসের ভাড়া যথাসময়ে দিতো।

ফ্যাক্টরির মালিকদের আচরণও শুনেছি খুব ভালো। মালিক কর্মচারীরা মিলেমিশে কাজ করে। বেতন কম হলেও যাও। কাজ শুরু কর।"

অতঃপর ২ এপ্রিল ১৯৯৫ আমার ভিন্ন রকম যাত্রা শুরু। পলিপ্যাকার হিসাবে কাজ শুরু করি আমি। সেই শুরুটাই যে আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের বীজ বুনে দিয়েছে তা তখনো জানতে পারিনি। তবে একটা জিনিস বুঝেছিলাম কাজটাকে বুঝে নিয়ে যদি সঠিক এবং সুন্দরভাবে তা শেষ করা যায় তাহলে উন্নতি করা যাবে। আমার নিষ্পাপ শিশু পুত্র এবং দারিদ্রের কথা চিন্তা করে শুধুই কাজে মনোযোগ দিলাম। মাননীয় পরিচালক জনাব সালাম স্যারের চোখে পড়লাম। স্যারের অনুপ্রেরণা, আদেশ, উপদেশ আমার চলার গতি পাল্টে দিতে লাগলো। পলিপ্যাকার থেকে জুনিয়র সুপাইভাইজার, সুপারভাইজার, ফিনিশিং ইনচার্জ, জুনিয়র ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার এবং সর্বশেষ ডেপুটি ম্যানেজার হিসেবে আজ আমি অনেক সম্মান এবং অনেক স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি। আমার সেই মানবেতর দিনগুলো আজ অনেক বর্ণিল। বহু রঙের ছটা লেগেছে তাতে।

আমার শ্রদ্ধেয় পরিচালক স্যারগণ-তাঁদেরকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। শুধু আমার স্বপ্নময় জীবনের রূপকার হয়ে উঠার জন্যই নয়, আমার মতো শত শত মলিন, অসহায় মাহবুবকে স্বপ্নময় করে তোলার জন্য।

মায়ের হাসি

জেসমিন আক্তার
সহকারী কাটার
জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিমিটেড

মাগো আমি তোমায় ছেড়ে থাকি বহু দূরে
মনটা আমার পড়ে থাকে সদাই তোমার তরে।
দুঃখ যদি পাইগো, মনে পড়ে তোমায়
সকল দুঃখ মুছে যায়, আদর করলে আমায়।
কত আশা ছিল মাকে রাখবো সদাই সুখে,
পাশে যেন থাকতে পারি মায়ের সকল দুঃখে।
ভুলেও কভু মাকে যেন নাহি করি হেলা,
মায়ের পায়ে স্বর্গ আমার, বলেন উপরওয়ালা।
শিশুকালে আমায় নিয়ে করেছ কত কষ্ট
তোমার সকল চেষ্টা মাগো, করবনা তো নষ্ট।
তুমি যদি সুখে থাকো তাতেই আমার সুখ,
তোমার মুখে দেখলে হাসি, ভরে আমার বুক।
মা আমার অতি আপন, মা আমার প্রাণ,
মায়ের কাছে বড়ই প্রিয় স্নেহের সন্তান।
মায়ের মুখে দেখি যেন মুক্তঝরা হাসি,
তাইতো আমি ব্যাবিলনে চাকুরী করতে আসি।

বহুদিন পর এলাম

মোঃ মোহন
অপারেটর, ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

বালু চরে ছোট্ট ঘরে
তোমায় নিতে এলাম
যাবে যদি চলো তবে বহুদিন পর এলাম।

সেথায় নাইবা থাকুক দালান কোঠা
নাইবা রূপের মেলা
আছে মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস
বসে ফুলের মেলা।

বন ফুলে সাজাবো তোমায়
এই শপথ নিলাম,
যাবে যদি চলো তবে, বহুদিন পর এলাম।

ছোট্ট ঘর আছে সেথায় বনফুলের ছানি,
প্রাণে প্রাণে বাঁধা আছে
ঝরে নাকো পানি।
সবুজ ঘাসের বিছানা সেথায়
তোমায় বলে গেলাম,
যাবে যদি চলো তবে বহুদিন পর এলাম।

স্বপ্ন ছায়া

শুভ্র দেব সাহা
জুনিয়র অফিসার, মার্কেটিং এ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ওভেন টপ্‌স, ব্যাবিলন গ্রুপ

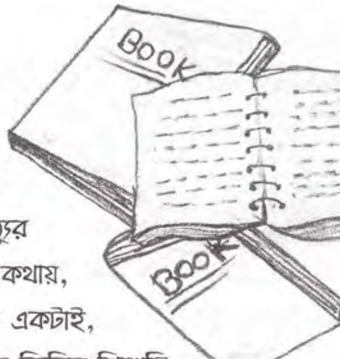

স্বপ্ন ছোট্ট একটা শব্দ, কিন্তু ব্যাপ্তি অনেক। জীবনকে উপভোগ করার জন্য, জীবনের স্বাদ গ্রহণের জন্য স্বপ্নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তেমনি ছোট্ট একটা স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় আসা, খুব ছোটবেলা থেকেই একটা স্বপ্ন বুকে নিয়ে বড় হয়েছি। অনেক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় স্বপ্নটাকে আজও পূরণ করতে পারিনি। আশা করি মৃত্যুর আগের দিন হলেও স্বপ্নটা পূরণের চেষ্টা করে যাব। যাইহোক এবার আসি আমার স্বপ্নের কথায়, জন্মসূত্রে হিন্দু হলেও রাজবাড়ীর গীর্জাতে আমার যাতায়াত অনেক ছোট থেকেই। উদ্দেশ্য একটাই, আমার খুব কাছের বন্ধুর সাথে সময় কাটানো। কিন্তু এই সময় পার করতে গিয়েই অনেক জিনিস শিখেছি, যা আমার জীবনে অনেক অবদান রেখেছে। সেই গীর্জাতেই একবার পরিচয় হয় ফাদার পিটারসন-এর সাথে। তখন আমার বয়স বড় জোর ৯ কি ১০ বছর। আমার সৌভাগ্যই বলতে হয়, ওনার সাথে অনেকটা সময় কাটানোর সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে অনেক গল্প বলেছিলেন সেটা আমার এখনও মনে আছে। তিনি অনাথ শিশুদের নিয়ে কাজ করছিলেন। তার কাজগুলো আমার অনেক ভালো লেগেছিল। এতটাই ভালো লেগেছিল যে বাড়িতে ফিরে বাবাকে বললাম একটা অনাথ আশ্রম করে দেয়ার জন্য। বাবা অনেক খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু আমাকে একটা অনাথ আশ্রম করে দেয়া বা তার ব্যয়ভার বহন করা তারপক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় তিনি আমাকে বলেছিলেন "বাবু বড় হয়ে তুমি আশ্রম কর, আমি তোমাকে আমার সাধ্যমত সাহায্য করব।" আমিও বাবার কথায় দিন গুনতে শুরু করি বড় হওয়ার, কিন্তু দিন যেন আর যেতে চায় না। যত দিন যায় আমার মনের সুপ্ত স্বপ্ন যেন আর অপেক্ষা করতে চায় না।

অনেকের সাথেই আলোচনা করলাম কিন্তু কারও কাছ থেকেই সবুজ সংকেত পেলাম না। মনের অস্থিরতা বাড়তেই থাকে। অবশেষে ২০০২ সালে আবার সাক্ষাত পাই ফাদার পিটারসনের। আমাকে উনি চিনতেই পারেননি। আর পারবেনই বা কি করে, গত ৫ বছরে আমার জীবনে অনেক বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটায় আমাকে আমার নিজেরই চিনতে কষ্ট হত। ফাদারের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে সব কথা বললাম। উনি হাসলেন এবং বললেন "মাই ডিয়ার সান ইউ হ্যাভ টু ওয়েট, নোবডি উইল সাপোর্ট ইউ আনটিল ইউ ক্যান স্টার্ট।" বুঝতে পারলাম আমাকে আরও ওয়েট করতে হবে। ২০০৩ সালে জানুয়ারি মাসে আমার কিছু বন্ধুর সাথেও আলাপ করলাম এবং ঠিক করলাম অনাথ আশ্রম না পারি কিছু একটা করতে হবে, যার ফলে আমরা সমাজের জন্য কিছু করতে পারি। সেখানেও বিধি বাম। কেউই এলোনা আমাকে সাহায্য করতে। বাবার সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিলাম, কেউ না আসুক একা করা যায় এমন কিছু করব। যেই ভাবা সেই কাজ। একটা টিনের তৈরি চোঙা নিয়ে গ্রামে ঘুরতে লাগলাম আর প্রচার করতে লাগলাম যে, এলাকার বয়স্ক মানুষ যারা স্বাক্ষর করতে পারেন না তাদেরকে শুক্রবার রাতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তেমন সাড়া পেলাম না ১ম সপ্তাহে। ২য় সপ্তাহে সাত থেকে দশ জন আসলেন নাম নিবন্ধনের জন্য। বিশ্বাস করুন সেদিন আমি পুরো স্বর্গটা নিজের হাতে পাওয়ার মত আনন্দ পেয়েছিলাম। নির্ধারিত সময়ে সবাই আমার বাড়িতে আসলেন। আমি আমার রুমেই তাদেরকে শিখাতে শুরু করলাম, তারপর একে একে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী পেলাম, কিন্তু এত লোককে জায়গা দিতে পারলাম না। বাবা আমাদের উঠানে একটা ঘর তুলে দিলেন। চলতে থাকল আমার শিক্ষাদান কর্মসূচি।

একে একে আমার দুই বন্ধু এবং এক বান্ধবী আমার সাথে যোগ দিল। এভাবেই চলা শুরু করে এখন আমরা প্রায় ৫০০ জন শিশুকে বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। আমরা রাজবাড়ী শহরের ব্যবসায়ী, চাকরিজীবীদের থেকে সাহায্য নিয়েই এটা

করছি। এখন আমাদের দুটি বিদ্যালয়ও আছে। কিন্তু আমার মনের স্বপ্ন এখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে। এখনও আমি একটি অনাথ আশ্রম করে তুলতে পারিনি। চেষ্টা করে চলেছি। ভাবছেন কি দিয়ে শুরু করে কি লিখছি, হ্যাঁ আপনি ঠিকই ভাবছেন। এগুলো লেখার কোন দরকারই ছিল না। কিন্তু লিখলাম হয়তো তার কারণটা নিচের অংশটুকু পড়ে বুঝতে পারবেন। আর সময় নষ্ট না করে আসল কথায় আসি কেমন?

একটা স্বপ্ন বুকে নিয়েই ঢাকায় পাড়ি জমাই সেই ২০০৬ সালের আগস্ট মাসের ৪ তারিখ। উদ্দেশ্য UCC-তে কোচিং করে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরও আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হল। ভর্তি হলাম BGMEA Institute of Fashion and Technology-তে। ২০০৭ সালের জুলাই থেকে শুরু করে ২০১০ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত একটাই আশা পাস করে চাকরি করব আর মনের সুপ্ত বাসনা পূরণ করব। ৪ বছর ধরে Babylon Group আর এমদাদ স্যার নাম দুটি শুনতে শুনতে এদের প্রতি আলাদা একটা সম্মানবোধ তৈরি হল। সুযোগও পেলাম ব্যাবিলনের হক স্যারের অবদানে। সেই নভেম্বর থেকে আজ অবধি Babylon-এ থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এমদাদ স্যারের সম্পর্কে যা যা শুনে এসেছিলাম পেলাম তার অনেক বেশি। যদিও স্যারের সাথে আমার সাক্ষাতের তেমন একটা সুযোগ হয় না, তারপরও তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক ভালো একটা ধারনা আমার হয়েছে। ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রাক্তন কর্মকর্তা, কর্মচারী, ব্যবসায়িক অংশীদারদের কথা শুনে অনেক কিছুই জানলাম এদের সম্পর্কে। উক্ত অনুষ্ঠানের পরে আমার মনের সুপ্ত স্বপ্ন আবারও আমাকে তাড়া দিচ্ছে। আর সেই তাড়া থেকেই আমি আবার একটা চেষ্টা করছি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে। জানি না এবারও হবে কিনা তবুও একটা চেষ্টা, আর স্বপ্ন পূরণের জন্য ৫ জন বন্ধুকে সহযাত্রী হওয়ার প্রস্তাব করেছি। না তাদের থেকে আমি কোন আর্থিক সাহায্য চাই না, চাই শুধু তাদের সঙ্গ। কারণ এই দুনিয়ায় একা পথ চলা খুব কঠিন। আর আমার বন্ধুদের এই সংগটাই আমাকে আমার স্বপ্ন পূরণ করতে সাহায্য করবে।

বন্ধুদেরকে আমার একটাই কথা বলার, আমাকে মাঝপথে ছেড়ে চলে যেও না প্লিজ। আর উপরের সবটুকু লেখাই আমার এই বন্ধুদের উদ্দেশ্যে। শূন্য থেকে শুরু করেও অনেক কিছুই করা সম্ভব।

জানিনা আমার বন্ধুরা আমার এই লেখাটি পড়ার সুযোগ পাবে কিনা!

আমার স্বপ্ন পূরণ করার যে শক্তিটা আমি ফিরে পেয়েছি তার জন্য ব্যাবিলনের ২৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানকে অনেক ধন্যবাদ।

জানি আমার এই লেখা পড়তে পড়তে অনেকেই বিরক্ত হয়েছেন, অনেকেই আমার লেখার মাথা মুন্ডু কিছুই খুঁজে পাননি। তবুও আমার এই পচা লেখা পড়ে যদি কেউ কোন ভাল কাজের উৎসাহ খুঁজে পান, তাহলেই আমি স্বার্থক।

"আসুন আমরা সবাই প্রতিদিন অন্তত একটা ভাল কাজ করি।"

একাত্তরের সোনাভান

মাহবুব আল মামুন বিপ্লব
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডাকশন ম্যানেজার
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

"তোমরা সবাই চলি যাও। মুই একলায় থাকিম। আরগুলো আসপে, ওমার খাওয়ার ব্যবস্থা কাই করবে? মুই করিম।" এক নিঃশ্বাসে সোনাভান কথাগুলো বলে আর তাড়া দেয় তাদের। সোনাভান তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে, যেন কমান্ডার-ইন-চিফ। কখন যে পাকিস্তানী মিলিটারি বাহিনী গ্রামে আসে তার ঠিক নেই। তারা জেনে ফেলেছে এখানে মুক্তি বাহিনীর ঘাঁটি আছে। তাই সময়ে অসময়ে গাড়ি নিয়ে এসে পুরো গ্রাম চক্কর দিয়ে যায়। ওরা আর নিজেদের এদেশে নিরাপদ মনে করে না। কারণ মুক্তি নামের মানুষকে তারা ভীষণ ভয় পায়।

গ্রামের যুবক ছেলেরা সোনাভানের কথায় উৎসাহিত হয়ে যুদ্ধে যায়। দেশ মাতৃকাকে পাকিস্তানীদের গ্রাস থেকে মুক্ত করার প্রত্যয় তাদের চোখে মুখে। রাতের ঘুটঘুটে আঁধারে পিপীলিকার মত সারিবদ্ধ হয়ে পাট ক্ষেতের ভিতর দিয়ে রওনা হয়। সীমান্তের কাছে পৌঁছাতে প্রায় তিন দিন সময় লাগে। ভোর হওয়ার সংগে সংগে জঙ্গল বা দিগন্ত বিস্তৃত পাটের ক্ষেতে লুকিয়ে পড়ে। সংগে থাকা শুকনো খাবার খেয়ে জীবন বাঁচায়। ভালো মানুষের সন্ধান পেলে তাদের বাড়িতেও কখনো কখনো আশ্রয় নেয়। হাতিয়া গ্রামটিতে খুব বেশি মিলিটারি আসতে পারে না। কারণ একে তো নিচু এলাকা, তারপর রাস্তাঘাট বর্ষার পানিতে ডুবে একাকার। তাই ওরা এবং অনেকেই গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। এমনি করে একদিন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। পথে অনেক লোকজনের সংগে দেখা হয়। কিন্তু কাউকে কিছু বলার সাহস হয় না। সবাই ভীত...। অজানা জায়গা, অজানা দেশ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বুঝতে পারে না তারা কোথায় যাবে, কি করবে। ওদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, একজন ধুতিপরা লোক তাদের জিজ্ঞাসা করল, "দাদা আপনারা কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন।" বাংলাদেশের নামটি শুনে খুব খুশিতে বলে উঠল, "হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি। ক্যাম্পে যাব, রাস্তাটি চিনিয়ে দিন তো।" ওরা যাচ্ছে আর গর্ব ভরে বলছে বাংলাদেশ, আমাদের বাংলাদেশ। বলতে বলতে ওরা ক্যাম্পে চলে এল। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে তাঁবুর উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা শ্রাণশিবির। ক্যাম্পে এসেই ওরা ট্রেনিং নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ক্যাম্পের দলনেতা তাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দিলেন। ওরা ট্রেনিং-এ ব্যস্ত, দেশকে মুক্ত করতে হবে যে।

সোনাভান ওদের বিদায় দিয়ে যেন পরম স্বস্তি পেল। পরম নিশ্চিন্ত। আর মিলিটারি গ্রামে আসবে না। ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারে সোনাভানের নানীর বাড়ি। তারা বেশ বড়লোক। তাদের খবর নেয়ার কোন সুযোগ নেই। মামারা তার কোন খোঁজ-খবর নেয় না তার এমন ভূমিকার কারণে। তারা মনে করে পাকিস্তানকে যারা ভাঙতে সাহায্য করছে তারা এদেশের শত্রু। আর যাই হোক শত্রুর সংগে কোন সম্পর্ক নেই। পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করা পবিত্র দায়িত্ব। তাই সোনাভানের মামারা কেউ রাজাকার, কেউ আল শামস, কেউ আল-বদর বাহিনীতে যোগ দিয়ে পবিত্র দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত। কিন্তু সোনাভানের নানী তার অবাধ্য ছেলেদের এহেন রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে খুবই লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করতে লাগল। গ্রামের অনেক মানুষ তাকে দেখলে রাজাকারের মা বলে টিপ্পনী কাটে। বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করে। যা সে সহ্য করতে পারে না। তাই রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে বাড়ি ছেড়ে পাশের গ্রামে সোনাভানের অন্য কোন বোনের বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং প্রতিজ্ঞা করে সে নিজেও স্বাধীনতার জন্য কাজ করবে। জীবন দিয়ে হলেও এদেশ স্বাধীন দেখতে চায়।

নানী বাড়ির খবর না পাওয়ায় সোনাভান স্থির থাকতে পারে না। এখন সে একেবারে একা। ছেলেমেয়েরা যে যার কর্মস্থলে। তাদেরও দীর্ঘদিন ধরে কোন খবর পাচ্ছে না। অস্থির সোনাভান একদিন সাহস করে রাস্তায় বের হল। বোরখা পরিহিত সোনাভান অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে শহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠল। ফজর আলী সোনাভানকে দেখে বলল, "তুমি কেমন করে আসলে, আর্মিরা তোমাকে দেখে নাই?" "না খালু ভাগ্যটা ভাল, তাই কোন রকমে এতটা পথ আসবার পারনু। আমার বোন, নানীদের খবর জানেন? ছেলেমেয়েরা কোথায় তাও জানি না। পাড়ার অনেক ছেলেপেলে

ওপারে গেছে ট্রেনিং নিতে তাদেরও খবর পাই না।" বলেই জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করল।

খালু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "সোনাভান শব্দ কর না, মা। রাস্তার ধারে বাড়ি। আর্মিরা জানতে পারলে বাড়ির কাউকে জীবিত রাখবে না। তোমার খালা, আমি আর কাজের ছেলে আজিজ ছাড়া সবাই চলে গেছে গ্রামের ভিতর দিয়ে অনেক দূরে। তুমি চিন্তা কর না, আমি খবর নেওয়ার জন্য লোক পাঠাচ্ছি।" একদিন ফজর আলী সোনাভানের নানীর বাড়িতে লোক পাঠালো। লোকটি অনেক ঝুঁকি নিয়ে সোনাভানের নানীর বাড়িতে গেল। বাড়ির মানুষের কাছে সব কিছু শুনে সে ফিরে এল। বলল, "চাচা গেছনু সোনাভানের নানীর বাড়িত। পাড়াত একটা মানুষও নাই। শুধু বাড়িত একজন থুরথুরে বুড়ি। এক পা দুই পা করে বাড়িত ঢুকেই মনে হলো ভূতের বাড়ি। হামাক দেখিয়ায় হাউমাউ করে কাঁদবার নাগিল। বলল গতরাতে বাড়ির পুরুষ ও মহিলাগুলোকে লাইন করে দাঁড় করালো উঠানে। এর মধ্যে সোনাভানের নানীও ছিল। মুই খালি আল্লাহকে ডাকছিনু। হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম ছয় সাতটা শব্দ হলো। বাইরে রক্ত দেখলি? ঐ রক্ত ওদের। সবাইকে শেষ করেছে গুলি করে। শয়তানরা যাবার সময় সোনাভানের বোনটাকে ধরি নিয়ে গেছে। চানদের লাহান সুন্দর আছিল মাইয়াটা। বলেই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।"

আজিজের মুখে পাকিস্তানী মিলিটারিদের এমন বর্বরতার কথা শুনে সোনাভান কান্নায় ভেঙে পড়ল। আজিজকে নিয়ে সে রওনা দিল তার বোনের বাড়ির পথে। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ও ঝুঁকি এড়িয়ে সে তার বোনের বাড়িতে পৌঁছালো। বেশ কয়েকজন মানুষ লাশগুলো সৎকার করার জন্য জড়ো হয়েছে। গুলিবিদ্ধ মৃত নানীকে দেখে সোনাভান প্রায় উম্মাদ হয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে নিজেও সৎকারে সাহায্য করতে লাগল। কোন রকমে লাশগুলো মাটি চাপা দিয়ে লোকগুলো সটকে পড়ল জীবন বাঁচানোর তাগিদে ফের যদি রাজাকার, মিলিটারিরা ফিরে আসে। তারা সারারাত জংগলে বসে থাকল। ভোর হলে হাঁটা শুরু করল। কোথায় যাবে তারা জানে না। সারারাত ঘুমায়ওনি। শুধু হাঁটছে গ্রামের পর গ্রাম।

এভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারা এক সময় ভারতীয় সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে এসে পোঁছাল। গ্রামটি মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি। তারা সুযোগমত মিলিটারিদের উপর হামলা চালিয়ে আবার এখানে ফিরে আসে। সহযোদ্ধাদের সাথে সলাপরামর্শ করে। পরবর্তী অপারেশনের পরিকল্পনা করে। এই গ্রামটিকে আশ্রয়ের উপযুক্ত মনে হলো সোনাভানের কাছে। এখান থেকেই সম্ভব দেশের জন্য লড়াইরত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা। যে দেশের জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছে বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা। সোনাভান এই গ্রামে অবস্থান করে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে লাগল। অবসরে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন বীরত্বগাঁথা অপারেশনের গল্প কিংবা রেডিওতে যুদ্ধের খবর শোনে। একদিন মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানী সেনাদের জন্য গোলাবারুদ বহনকারী ট্রেন জেলা শহর হতে উলিপুর যাওয়ার পথে হালাবট নামক স্থানে কিভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রায় সকলকে মেরে ফেলে। আবার ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দেওয়ার সময় মিলিটারিদের নৌকা কিভাবে গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে ডুবিয়ে দেওয়া হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এ গল্পগুলো শুনে অনেক ক্ষতি অনেক কষ্টের মধ্যেও সোনাভান সুখ বোধ করে, আনন্দ পায়। মুক্তি বাহিনীর হাতে পাকিস্তানী সেনাদের পরাজয়ে সোনাভান বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশের অস্তিত্ব অনুভব করে। বাংলাদেশের গন্ধ পায়। কল্পনা করে স্বাধীন দেশের আকাশে দেশের প্রতিটি মানুষ এক একটি মুক্ত বিহঙ্গ।

সোনাভান মাঝে মাঝে উঠানে এসে বসে। ভাবে কোথায় ছিল কোথায় এলো। সে বাড়ি যেতে চায়। সারাদেশে তীব্র লড়াই চলছে, বের হওয়ার কোন পথ নেই। এমনিভাবে নয় মাস কেটে যায়। এক শুভদিনে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব দেখা গেল। সোনাভান দেখছে গ্রামের সবাই স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন বাংলা বলে শ্লোগান দিচ্ছে। লাল সবুজের পতাকা পতপত করে আকাশে উড়ছে। সে এখন স্বাধীন দেশের নাগরিক। এরকম একটি ছবিই তো সে মনে মনে এঁকেছিল-যা দীর্ঘ সংগ্রাম আর অনেক জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা বীরের বেশে যে যার বাড়িতে ফিরে গেল। আশ্রয় নেয়া গ্রামটি একসময় ফাঁকা হয়ে যায়। সোনাভান নিজেও তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসে। তার বাড়িটা কারা যেন পুড়িয়ে দিয়েছে। খোলা মাঠ হয়ে গেছে বাড়িটা। গ্রামের লোকজন কিছু কিছু করে ফিরছে। যে যার মত করে চলছে। যেন কেউ কাউকে চিনছে না। সোনাভান ছেলেগুলোকেও দেখতে পাচ্ছে না। কি জানি ওরা হয়তো ফেরেনি, মনে মনে ভাবে সে। হঠাৎ সোনাভান দেখতে পেল তাদের মধ্যে একজন খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে বলল, "সোনাবু ওরা নয় জনই এক যুদ্ধে মারা গেছে। মুই

জংগলের মধ্যে লুকিয়ে থাকায় তাই কোনরকমে বাঁচবার পারছি। শুধু পায়ে গুলি লাগছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার দুদিন আগে। সোনাবু তোর কথা হামরা মাঝে মধ্যে আলোচনা করতাম। তুই তো হামার গুলাক খাবার দিয়া, রাতে থাকপের জাগা দিয়া যুদ্ধ করছিস। তুই তো নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা। চল এলা থাকি তুই হামার বাড়িত থাকপু।" সে সোনাভানকে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। মাঝে মাঝেই সে স্মরণ করে তার অতীতকে। তার স্বামীর মৃত্যু, মেয়ে ও বোনের নিখোঁজ হওয়া, পাকিস্তানী হানাদারদের হাতে নানী ও ছেলের মৃত্যু। শেষ হয়ে গেছে তার সব কিছু। সে এখন একা, তার কোথাও কেউ নাই। স্বাধীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন। ঠিক এই দেশটার মত। তাই সোনাভান আবার হাঁটা শুরু করে স্বামীর ভিটার উদ্দেশ্যে।

শহীদ স্মরণে

মোঃ আসিফ খান
কিউসি ইন্সপেক্টর
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

মায়ের মুখের বুলির জন্য
দিয়েছে যারা প্রাণ
ওরা বীর ওরা শহীদ
ওরাই দেশের মান।

হাজার শ্রমিক, হাজার প্রেমিক
যারা দেশের ভক্ত,
মৃত্যুকে তারা না ক'রে ভয়
দিয়েছিলো অনেক রক্ত।

জানা-অজানা কত যে বীর
দেশের জন্য লড়ে
ওদের তরে গর্ব মোদের
সারাটি জীবন ধরে।

যে বীরেরা পিছু হটেনি
করেনি যারা শত্রুকে ভয়।
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে
করল তারা দেশকে জয়।

ইতিহাসে থাকবে লেখা
বীর শহীদের নাম,
ওরা শহীদ ওরা বীর
ওরাই দেশের মান।

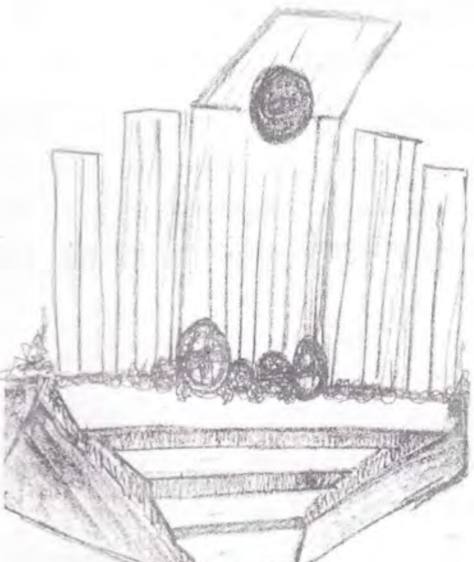

কাজেই সুখ

বায়জিদ মন্ডল
কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর, ফিনিশিং
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

মন্ডল পাড়ার ছেলে আমি
করি এইচ,এস,সি পাশ
চাকুরী পাইনা দ্বারে দ্বারে
ঘুরি বার মাস।

মা বাবার বোঝা আমি
না পেয়ে কোন কাজ
চোখ গরম আর কাজের খোঁটা
শুনি সকাল সাঁঝ।

অনেক জায়গায় ঘুরে ফিরে
চাকুরী নিলাম ব্যাবিলনে
মালিক মোদের খুবি ভাল
পাওনা মেটায় নিয়ম মেনে।

কাজে যেমন কষ্ট আছে
তেমনি আছে সুখ,
মাস শেষে টাকা পেলে
দুঃখ কষ্ট যাই ভুলে
দেখলে টাকার মুখ।

মাসের শেষে বেতন তুলে
কিছু পাঠাই বাড়িতে
মা খুশি বাবা খুশি
বুক ভরে যায় হাসিতে।

এক লাবনীর কথা

মুহাম্মদ সাইফুল হক
সিনিয়র ম্যানেজার, মার্কেটিং এ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং
ওভেন টপ্স, ব্যাবিলন গ্রুপ

দীর্ঘ পঁচিশ বছর একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করে অবসর নিয়েছেন রহিম শেখ । গতকাল । কিন্তু একদম মনে নেই তার । তাই অফিস যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন সকালে যথারীতি । ছেলে আবীর তাকে মনে করিয়ে দেয় – তুমি না কাজ থেকে বিদায় নিয়ে এলে কাল? আজ আবার অফিস যাবে কেন? লজ্জা পেলেন তিনি ছেলের কাছে । তবে ছেলে তার মেধাবী । বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে পোস্ট গ্রাজুয়েশনের জন্য এখন বিদেশি ভার্সিটিগুলোতে স্কলারশিপের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । যুক্তরাজ্যের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক সাড়াও মিলেছে ।

বারান্দায় রাখা হেলান চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে গতকালের বিদায় সংবর্ধনার কথা ভাবছিলেন রহিম শেখ । কয়েকজন সহকর্মী খুব কেঁদেছিলেন । এক পর্যায়ে তিনিও চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি ।

২৫ বছরের চাকরিজীবনের কত কথাই না মনে পড়তে লাগল । মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের কথা । কলেজ শেষ করেই চাকরি নিয়েছিলেন একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে । ইচ্ছে ছিল উচ্চতর পড়াশুনা করবেন – উঁচু পদের সরকারী কর্মকর্তা হবেন এক সময় । তা আর হয়ে উঠল না । বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটি তার ভাল লেগে গেল । কাজের পরিবেশ – সহকর্মীদের সহৃদয় ব্যবহার – উর্দ্ধতনদের আদর স্নেহ; পরিশেষে তার দ্রুত পদোন্নতি – এসব মিলে তিনি প্রতিষ্ঠানটির মায়াজালে আটকা পড়ে গেলেন ।

থাকতেন পুরনো ঢাকার একটি মেসে । দিনের শেষে কাজ থেকে ফিরে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই আড্ডায় মেতে উঠতেন রুমমেটদের সাথে । বয়সে তরুণ মিষ্টভাষী ও সুদর্শন রহিম শেখকে বন্ধুমহলে সহজেই সবাই খুব আপন করে নিতো । নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেয়া রহিম শেখ ছিলেন দুই ভাই আর এক বোনের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ । বাবার সংসারের দায় মেটাতে তাকে মাঝে মধ্যেই ধার-কর্জ করতে হতো মেসের বড় ভাই কলিমুল্লাহর কাছ থেকে । মনে পড়ে তার সেই দিনটির কথা । কলিমুল্লাহ তাকে বলেছিলেন –

– কি মিয়া চেহারাখানতো নায়কের লাহান, প্রেম-ট্রেম নাই নাকি?
– নারে ভাই ওসব আমার ভাগ্যে নাই । সবিনয়ে বললেন তিনি ।
– বল কি মিয়া! আচ্ছা যাই হউক, প্রেম না থাকুক বিয়া করবা?
– কি যে বলেন! নিজেই চলতে পারিনা বিয়ে করলে বউকে খাওয়াবো কি?
– সেইটা দেখা যাবে । বিয়া করবা কিনা কও ।
– বিয়ে করবনা তাতো বলি নাই ।
– তাইলে এক কাজ করো । কাইলকা একটু আগে আইসো অফিস থেকা । তোমারে আমার এক আত্মীয়র বাসায় নিয়া যাবো ।

পরদিন সন্ধ্যায় কলিমুল্লাহ তাকে নিয়ে গেলেন একই পাড়ার একটি দোতলা বাড়িতে । কলিংবেল টিপতে দরজা খুলে দিলেন কলিমুল্লাহ ভাইয়ের দু:সম্পর্কের আত্মীয় সোহরাব আলী । আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানালেন ভদ্রলোক দুজনকে । বসার ঘরে ঢুকে খুব ভাল লাগল রহিম শেখের । পরিপাটি করে গোছানো ঘরখানা । একটু পরেই এলেন গৃহকর্ত্রী । কলিমুল্লাহ রহিম শেখকে পরিচয় করিয়ে দিলেন তার মেসের রুমমেট হিসেবে । দারুণ সমাদৃত হলেন রহিম শেখ সেই বাড়িতে । এরপর আরও বেশ কবার গেছেন তিনি ঐ বাড়িতে কলিমুল্লাহ ভাইয়ের সাথে । গৃহকর্তা ও কর্ত্রীর সাদর আমন্ত্রণ ও আন্তরিক ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন এবং সময়ের সাথে সাথে তা বেড়েছে । এর মধ্যে তিনি ঐ বাড়িতে একটি তৃতীয় সত্তার অস্তিত্ব টের পেয়েছেন ।

জেনেছেন অন্তরালবর্তিণী পরীক্ষা ও পড়াশুনা নিয়ে বেশ ব্যস্ত থাকেন। এমন একটি চমৎকার পরিবারের মেয়ে পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকবে সেটাই স্বাভাবিক ভেবেছেন তিনি। এই অদেখা রহস্যময়ীর প্রতি ক্রমে ক্রমে তার একটা আকর্ষণ তৈরি হতে থাকে। যত সময় যায় তার আকর্ষণের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এক সময় বড় ভাইতুল্য বন্ধু ও মেসসংগী কলিমুল্লাহর কাছে ব্যাপারটা আর চেপে রাখতে পারলেন না তিনি। কিন্তু আশ্চর্য, কলিমুল্লাহ যেন গা করেন না। কৌশলে এড়িয়ে যান। পরে বুঝতে পারেন তার আগ্রহ বাড়াবার এটাও একটা কৌশল ছিল কলিমুল্লাহর।

একদিন কলিমুল্লাহ তাকে ডেকে বসালেন। তারপর বললেন -
- না দেইখাই প্রেমে পইড়া গেছ লাবনীর? বল বিয়া করবা কিনা। করলে রাজ্য রাজকন্যা দুইটাই পাইবা।
- পাত্রীই তো দেখলাম না আজ পর্যন্ত। বিয়ে করবো কি করে? কাতর কণ্ঠে জানান রহিম শেখ।
- ভাইবোনা ব্যবস্থা করতাছি।

এরপরের ঘটনাগুলো যেন বেশ দ্রুতই ঘটে গেল। পাত্রী দেখার ব্যবস্থা করতে আর দেরি করেননি কলিমুল্লাহ। সেজেগুজে একদিন গেলেন তিনি পাত্রী দেখতে সোহরাব আলী সাহেবের তথা মেয়ের বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়া ও আপ্যায়নের মাত্রা তাকে এতটা মুগ্ধ করেছিল যে তিনি ভাল করে পাত্রীর দিকে চেয়েই দেখার অবকাশ পাননি। মনে আছে অপূর্ব সাজে সেজে বসে থাকা লাবনীকে বেশ সুন্দরই লাগছিল তার। ওর খর্বাকৃতি বা স্থুল শারীরিক গঠন বলতে গেলে নজরেই পড়েনি তখন। বাবা-মার মতামতের কথাটাও তার মনে থাকলো না। তিনি জানিয়ে দিলেন পাত্রী তার পছন্দ হয়েছে-আর তার এই সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। তার জিদের কাছে পরে বাবা-মার আপত্তি গৌণ হয়ে গিয়েছিল। লাবনীকে দেখার সাতদিনের মাথায় তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

শ্বশুর-শাশুড়ির জামাই আদর - স্ত্রীর ভালবাসা সব মিলে ভালই যাচ্ছিল দিনগুলো। কিন্তু ভাল লাগাটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারল না। মাস কয়েক যেতেই তার মনে হল - তার স্ত্রী অর্থাৎ লাবনী যেন ঠিক মানসিকভাবে পুরো সুস্থ নয়। মাঝে মাঝে স্ত্রীর কিছু আচরণ তাকে ভাবিয়ে তোলে। একদিন গভীর রাতে স্ত্রী তাকে ডেকে তুলে বলে -
- আচ্ছা তুমি কি আমার সত্যিকারের স্বামী?
  স্ত্রীর কথায় হতবাক হয়ে যান রহিম শেখ। বলেন -
- হঠাৎ এ কথা বলছো? তোমার কি সন্দেহ আছে?
- দেখিতো - তোমার দাঁত দেখিতো।
  রহিম শেখ তার দাঁত দেখালেন। স্ত্রী বলে -
- ও সত্যিই তো! তুমিই আমার স্বামী।

আরো একটি ঘটনা মনে পড়ে রহিম শেখের। একবার ঈদের আগে বোনাস হিসাবে অফিস থেকে বেশকিছু টাকা পেয়েছিলেন। স্ত্রীকে তা জানিয়ে বলেছিলেন টাকাটা দিয়ে ভবিষ্যতে সংসারের জন্য একটা ভাল কিছু করার ইচ্ছে আছে তার। ক'দিন পর পাশের ফ্ল্যাটের ভাবীর কাছে যা শুনলেন তাতে তার আক্কেলগুড়ুম।

ভাবী জানালেন লাবনী নাকি তাকে বলেছে তার স্বামীর রোজগার ভালো। ঘুষও পায়, তবে খুবই কৃপণ। এবারের ঈদে অনেক টাকা পেয়েছে কিন্তু আমার জন্য কিছুই কেনেনি।

রহিম শেখের কষ্টের আর অন্ত রইলো না। কষ্টটা আরো বেড়ে গেল যখন জানলেন কথাগুলো তার স্ত্রী তার মা অর্থাৎ শাশুড়িকে পর্যন্ত বলেছে। ব্যাপারটা বিশ্বাস করে শাশুড়িও তাকে খোঁটা দিতে ছাড়লেন না। তাদের বিয়েতে শ্বশুরপক্ষ অনেক খরচ করেছেন- বর-কনেকে প্রচুর দামি উপহারও দিয়েছেন। এখন সে সব তুলেও শাশুড়ির খোঁটা শুনলেন তিনি। কাজেই বোনাসের টাকা দিয়ে তার বিশেষ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন আর হয়ে উঠল না।

কয়েক মাস পরের কথা। তার স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা হয়েছে। একদিন খাবার টেবিলে লাবনী তাকে আচমকা বলে বসলো -
- জানো আমার বাচ্চা কিন্তু আসলে একটি সাপ কিংবা ব্যাঙ হবে।

- কি আজেবাজে বকছ। এ সব উদ্ভট কথা আসছে কেন তোমার মাথায়?
- আমার বান্ধবী শ্রাবন্তী আমাকে বলেছে। সেটাই তোমাকে বললাম।

রহিম শেখ ভয় পেয়ে গেলেন। পরদিন সকালে তিনি তার শাশুড়িকে সব খুলে বললেন। বললেন তার আশঙ্কার কথাও। লাবনীর মানসিক সুস্থতা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুললেন। তার শাশুড়ি তাকে অবাক করে দিয়ে বললেন - এ সব তোমার ভুল ধারণা বাবা। লাবনীর কিছু হয়নি। ও সুস্থই আছে।

কিন্তু রহিম শেখ আশ্বস্ত হতে পারলেন না। স্ত্রীকে কোন সাইকাইয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাবেন ভাবলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। আজো তিনি অবাক হয়ে ভাবেন কেন সেদিন তিনি এই কাজটি করেননি। আলসেমি? স্ত্রীর প্রতি ধীরে ধীরে জন্মানো বীতশ্রদ্ধা? - একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার ফিরে যান রহিম শেখ সুদূর অতীতে।

অবশেষে ব্যাপারটা নিজের বাবা-মার গোচরে আনেন তিনি। এমনিতেই তার বাবা-মা এই বিয়েতে রাজি ছিলেন না। ছেলে-ছেলের বৌ বা ছেলের শ্বশুরবাড়ির সাথে একরকম সম্পর্কই রাখেননি তারা। ছেলের কথা শুনে সুদে-আসলে একহাত নিতে চাইলেন ছেলের শ্বশুরপক্ষের সাথে। সোজা অভিযোগ তুললেন তারা যে মেয়ের মানসিক সমস্যা গোপন রেখে তাদের ছেলেকে ঠকিয়েছেন মেয়েপক্ষ। প্রতারণা করেছেন তাদের ছেলের সাথে। বেশ একটা জটিল বিরোধে জড়িয়ে গেল দুটো পরিবার।

কি যে তার হয়েছিল তখন বলতে পারবেন না। ক্রমাগত বাবা-মার মন্ত্রণায় একদিন ঠিকই কৌশলে স্ত্রীকে তার বাবার বাড়িতে রেখে আসলেন তিনি। শ্বশুরপক্ষের অনেক অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে তিনি শ্বশুরবাড়ি যাওয়া থেকে বিরত থাকলেন। মাস দুয়েক পর খবর পেলেন তার স্ত্রীর গর্ভপাত হয়েছে। কষ্ট পেলেন খুব রহিম শেখ। মন খারাপ হলো ভীষণ। কিন্তু এ সব কিছুর জন্য মনে মনে স্ত্রীর মানসিক বিকৃতিকেই দায়ী করলেন। তিনি মন শক্ত করে ফেললেন। ভাবলেন আর কখনো ও বাড়িমুখো হবেন না তিনি। এরমধ্যে অবশ্য শ্বশুরপক্ষ থেকে নানাভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হলো। প্রথমে অনুরোধ-উপদেশ, পরে এমনকি হুমকি-ধামকি-সব প্রক্রিয়াই প্রয়োগ করা হলো। রহিম শেখ গললেন না - টললেন না।

সংসার জোড়া লাগার আশা ছেড়েই দিলেন একরকম রহিম শেখ। ডিভোর্সের কথা ভাবছিলেন। দেন-মোহরের টাকাসহ আনুসাঙ্গিক খরচ সামলাতে পারবেন না ভেবে আর ওপথে হাঁটা হয়নি। এমনি সময় একদিন অফিসে ডাক পড়ল তার প্রশাসনিক কর্মকর্তার চেম্বারে। সদালাপী কর্মকর্তা কথায় কথায় তাকে জানালেন তার শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে স্ত্রীর সাথে প্রতারণার অভিযোগ তোলা হয়েছে অফিসে।

কর্মকর্তা তার কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। সব শুনে তিনি তাকে কিছু সদুপদেশ দিলেন। বললেন ব্যাপারটি মিটিয়ে ফেলতে - যত দ্রুত সম্ভব। তার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়টি অফিসে চলে আসায় রহিম শেখ খুবই অস্বস্তি বোধ করলেন। তিনি কর্মকর্তাকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন একটা সুন্দর সুরাহার। এরপর থেকে কর্মকর্তা প্রায়ই রহিম শেখের কাছ থেকে জানতে চাইতেন কোন অগ্রগতি হয়েছে কিনা। ওদিকে শ্বশুরপক্ষকে তিনি জানাতেন রহিম শেখের আন্তরিক চেষ্টার কথা।

ইতোমধ্যে বিষয়টি কোম্পানির একজন পরিচালকের কানেও পৌঁছে গেছে। সেই পরিচালক একদিন তাকে ডেকে পাঠালেন। দুরু দুরু বুকে পরিচালকের কক্ষে প্রবেশ করলেন রহিম শেখ। কিন্তু পরিচালকের মুখে সাহস জাগানো স্নেহমাখা হাসি দেখে তার সব ভয়-অস্বস্তি চলে গেল। তিনি তাঁকেও সবকিছু খুলে বললেন। সব শুনে পরিচালক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। বোধ হয় মনের মধ্যে গুছিয়ে নিচ্ছিলেন কি বলবেন। এরপর তিনি অনেককিছুই বললেন। রহিম শেখ অবাক হয়েছিলেন সেদিন বেশ। তাকে বোঝাবার জন্য পরিচালক সেদিন তাঁর নিজ জীবনের কিছু ব্যক্তিগত বিষয়ও তাকে জানালেন।

প্রিয় পরিচালক সাহেব সেদিন তাকে বলেছিলেন যে, রহিম শেখের মত শিক্ষিত ও সচেতন মানুষদের দায়িত্ব শুধু তাদের কর্মক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়। পেশার প্রতি দায়িত্ব ও কমিটমেন্টের পাশাপাশি তার সমান প্রতিফলন থাকতে হবে

পরিবারের প্রতিও। পরিচালক সাহেবের কিছু যুক্তি, কিছু কথা আজো কানে বাজে রহিম শেখের। তিনি বলেছিলেন –

'মেয়েটিকে (লাবনীকে) তো আপনি নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন তাই না? পরে দেখলেন ওর কিছু কথা কিছু আচরণ স্বাভাবিক নয়। কেন উনি এমন আচরণ করতেন বা অদ্ভুত কথা বলতেন তার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা কি করেছেন কখনো? সম্ভবত করেননি। নিজেই স্বীকার করেছেন কোন সাইকাইয়াট্রিস্টের কাছে নেননি তাকে। আপনার স্ত্রী দেখতে সুন্দরী নন, বেঁটে, মোটা। সব সত্ত্বেও পছন্দ করা মেয়েকে আবেগবশতঃ স্বেচ্ছায় বিয়ে করে পরে বুঝতে পারেন ভুল হয়েছে। তাই না? আর তাই স্ত্রীর মানসিক বিকারটাকে অজুহাত করে স্ত্রীকে ত্যাগ করে দিলেন। এটা কোন্ ধরণের দায়িত্ববোধ, কোন্ ধরণের কমিটমেন্ট? স্ত্রীর প্রতি আপনার সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থাকলে আপনি শেষ চেষ্টা করে দেখতেন, কিন্তু তা করেননি। এটা এক ধরণের শঠতা, অসততা।'

পরিচালক সাহেবের সেদিনের কথাগুলো শুনতে শুনতে প্রতিবাদের ভাষা তিনি খুঁজে পাননি। ওনার কথাগুলো চাবুকের বাড়ির মতো এসে পড়ছিল তার গায়ে। সত্যিইতো তিনি স্ত্রীর রোগ সারাবার কোন আন্তরিক চেষ্টাই করেননি। আর তা না করে তাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত তো অপরাধেরই সামিল। রহিম শেখ জানেন তিনি ত্রুটি বা দুর্বলতামুক্ত নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে কখনো দায়িত্বহীন বা অসৎ বলে ভাবতে পারেননি। পরিচালক সাহেবের কথার যুক্তি মেনে নিলে নিজের অজান্তে তিনি এইসব অপরাধে অপরাধী – তার স্ত্রীর কাছে অন্ততঃ।

পরিচালক সাহেবের রুম থেকে বেরিয়ে এসে রহিম শেখের সেদিন মনে হয়েছিল – তার যেন চোখের সামনে থেকে একটা অন্ধাবরণ সরে গিয়েছিল, নতুন বোধোদয় হয়েছিল তার। নিজে থেকে তার যা বোঝা উচিৎ ছিল অনেক আগেই, তা সেদিন তিনি তার পরিচালকের সাথে ঘন্টাখানেকের বৈঠকে বুঝতে পারলেন। হঠাৎ তিনি চঞ্চল হয়ে পড়লেন। নাহ্ আর দেরি করা যাবে না। বড় ভুল করে ফেলেছেন। নিজেকে হঠাৎ নীচ লাগছে খুব। সেদিনই সন্ধ্যায় অফিস শেষে স্ত্রীকে আনতে চলে গেলেন। স্ত্রী-শ্বশুর-শাশুড়ির স্বকৃতজ্ঞ আনন্দমাখা মুখচ্ছবি দেখে তার বাবা-মার ভ্রুকুটি তিনি গায়েই মাখলেন না।

মনোরোগের ডাক্তার সমস্যার যা বিবরণ দিলেন তা খুবই আন্দাজযোগ্য। তার নিজেরই বোঝা উচিৎ ছিল। লাবনী বিয়ের পর থেকেই হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করেছিলো। স্বামী লম্বা ও সুপুরুষ। সে বেঁটে ও স্থুল – আবার দেখতেও তেমন সুন্দরী নয়। স্বামীর সঙ্গে অন্য অল্পবয়স্কা মেয়েদেরকে হেসে কথা বলতে দেখলেও তার হিংসে হতো – সন্দেহ হতো ওরা বোধ হয় তার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তার কাছ থেকে। রহিম শেখ স্ত্রীকে বোঝান – যা কিনা তার অনেক আগেই করা উচিৎ ছিল। তিনি স্ত্রীকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলেন –
'চেহারার সৌন্দর্যই কি সব? ভেতরের সৌন্দর্যটাই তো আসল আর স্থায়ী সৌন্দর্য। বাইরের চেহারা আর ক'দিন থাকে।'

রহিম শেখ-লাবনী বিয়ের পর এই প্রথম যেন একে অপরকে খুঁজে পান। ক'দিন আগেও যেটা অসম্ভব ছিল তা আজ খুবই সম্ভব হয়েছে। সুখের সংসার হয়েছে তাদের। কে জানতো মানসিক বিকারগ্রস্ত লাবনীর মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরা সদা লাস্যময়ী আর এক লাবনী লুকিয়ে ছিল। আদরে-সোহাগে ভরিয়ে দিতে পারে স্বামীর মনো-প্রাণ এমন এক লাবনীকে তিনি পেয়েও হারাতে বসেছিলেন। রহিম শেখ নীরবে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদয় করেন আর অফিসের পরিচালক সাহেবকে সশ্রদ্ধায় স্মরণ করেন।

রহিম শেখ-লাবনীর দ্বিতীয় জীবনের বছর ঘুরতে তাদের সংসার আলো করে জন্ম নিল এক পুত্র সন্তান। আবীর। দিন-মাস-বছর ঘুরে আবীর তার শৈশব, কৈশোর পার করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। লাবনী নিজের সুখ হারাম করে স্বামী ও ছেলেকে আগলে রেখেছেন। হাতে ধরে বড় করেছেন তার চোখের মনি আবীরকে। ছেলে আর স্বামীই তার যত সুখ, যত অহংকার।

বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা দীর্ঘ নিঃশ্বাসটাকে চেপে রাখতে পারেন না রহিম শেখ। লাবনীর শরীরের ভেতর কবে যে এক মরণব্যাধি বাসা বেঁধেছিল তা টের পাননি কেউ। যখন টের পেয়েছিলেন তখন বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। আবীর স্নাতক পাশ করেছে কৃতিত্বের সাথে – দেখে যেতে পারলেন না লাবনী।

পরিবারের প্রতিও। পরিচালক সাহেবের কিছু যুক্তি, কিছু কথা আজো কানে বাজে রহিম শেখের। তিনি বলেছিলেন -

'মেয়েটিকে (লাবনীকে) তো আপনি নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন তাই না? পরে দেখলেন ওর কিছু কথা কিছু আচরণ স্বাভাবিক নয়। কেন উনি এমন আচরণ করতেন বা অদ্ভুত কথা বলতেন তার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা কি করেছেন কখনো? সম্ভবত করেননি। নিজেই স্বীকার করেছেন কোন সাইকাইয়াট্রিস্টের কাছে নেননি তাকে। আপনার স্ত্রী দেখতে সুন্দরী নন, বেঁটে, মোটা। সব সত্ত্বেও পছন্দ করা মেয়েকে আবেগবশতঃ স্বেচ্ছায় বিয়ে করে পরে বুঝতে পারেন ভুল হয়েছে। তাই না? আর তাই স্ত্রীর মানসিক বিকারটাকে অজুহাত করে স্ত্রীকে ত্যাগ করে দিলেন। এটা কোন্ ধরণের দায়িত্ববোধ, কোন্ ধরণের কমিটমেন্ট? স্ত্রীর প্রতি আপনার সাধারণ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থাকলে আপনি শেষ চেষ্টা করে দেখতেন, কিন্তু তা করেননি। এটা এক ধরণের শঠতা, অসততা।'

পরিচালক সাহেবের সেদিনের কথাগুলো শুনতে শুনতে প্রতিবাদের ভাষা তিনি খুঁজে পাননি। ওনার কথাগুলো চাবুকের বাড়ির মতো এসে পড়ছিল তার গায়ে। সত্যিইতো তিনি স্ত্রীর রোগ সারাবার কোন আন্তরিক চেষ্টাই করেননি। আর তা না করে তাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত তো অপরাধেরই সামিল। রহিম শেখ জানেন তিনি ত্রুটি বা দুর্বলতামুক্ত নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকে কখনো দায়িত্বহীন বা অসৎ বলে ভাবতে পারেননি। পরিচালক সাহেবের কথার যুক্তি মেনে নিলে নিজের অজান্তে তিনি এইসব অপরাধে অপরাধী - তার স্ত্রীর কাছে অন্ততঃ।

পরিচালক সাহেবের রুম থেকে বেরিয়ে এসে রহিম শেখের সেদিন মনে হয়েছিল - তার যেন চোখের সামনে থেকে একটা অন্ধাবরণ সরে গিয়েছিল, নতুন বোধোদয় হয়েছিল তার। নিজে থেকে তার যা বোঝা উচিৎ ছিল অনেক আগেই, তা সেদিন তিনি তার পরিচালকের সাথে ঘন্টাখানেকের বৈঠকে বুঝতে পারলেন। হঠাৎ তিনি চঞ্চল হয়ে পড়লেন। নাহ্ আর দেরি করা যাবে না। বড় ভুল করে ফেলেছেন। নিজেকে হঠাৎ নীচ লাগছে খুব। সেদিনই সন্ধ্যায় অফিস শেষে স্ত্রীকে আনতে চলে গেলেন। স্ত্রী-শ্বশুর-শাশুড়ির স্বকৃতজ্ঞ আনন্দমাখা মুখচ্ছবি দেখে তার বাবা-মার ভ্রুকুটি তিনি গায়েই মাখলেন না।

মনোরোগের ডাক্তার সমস্যার যা বিবরণ দিলেন তা খুবই আন্দাজযোগ্য। তার নিজেরই বোঝা উচিৎ ছিল। লাবনী বিয়ের পর থেকেই হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করেছিলো। স্বামী লম্বা ও সুপুরুষ। সে বেঁটে ও স্থুল - আবার দেখতেও তেমন সুন্দরী নয়। স্বামীর সঙ্গে অন্য অল্পবয়স্কা মেয়েদেরকে হেসে কথা বলতে দেখলেও তার হিংসে হতো - সন্দেহ হতো ওরা বোধ হয় তার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তার কাছ থেকে। রহিম শেখ স্ত্রীকে বোঝান - যা কিনা তার অনেক আগেই করা উচিৎ ছিল। তিনি স্ত্রীকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলেন -
'চেহারার সৌন্দর্যই কি সব? ভেতরের সৌন্দর্যটাই তো আসল আর স্থায়ী সৌন্দর্য। বাইরের চেহারা আর ক'দিন থাকে।'

রহিম শেখ-লাবনী বিয়ের পর এই প্রথম যেন একে অপরকে খুঁজে পান। ক'দিন আগেও যেটা অসম্ভব ছিল তা আজ খুবই সম্ভব হয়েছে। সুখের সংসার হয়েছে তাদের। কে জানতো মানসিক বিকারগ্রস্ত লাবনীর মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরা সদা লাস্যময়ী আর এক লাবনী লুকিয়ে ছিল। আদরে-সোহাগে ভরিয়ে দিতে পারে স্বামীর মনো-প্রাণ এমন এক লাবনীকে তিনি পেয়েও হারাতে বসেছিলেন। রহিম শেখ নীরবে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদয় করেন আর অফিসের পরিচালক সাহেবকে সশ্রদ্ধায় স্মরণ করেন।

রহিম শেখ-লাবনীর দ্বিতীয় জীবনের বছর ঘুরতে তাদের সংসার আলো করে জন্ম নিল এক পুত্র সন্তান। আবীর। দিন-মাস-বছর ঘুরে আবীর তার শৈশব, কৈশোর পার করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। লাবনী নিজের সুখ হারাম করে স্বামী ও ছেলেকে আগলে রেখেছেন। হাতে ধরে বড় করেছেন তার চোখের মনি আবীরকে। ছেলে আর স্বামীই তার যত সুখ, যত অহংকার।

বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা দীর্ঘ নিঃশ্বাসটাকে চেপে রাখতে পারেন না রহিম শেখ। লাবনীর শরীরের ভেতর কবে যে এক মরণব্যাধি বাসা বেধেছিল তা টের পাননি কেউ। যখন টের পেয়েছিলেন তখন বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল। আবীর স্নাতক পাশ করেছে কৃতিত্বের সাথে - দেখে যেতে পারলেন না লাবনী।

স্ত্রীকে হারিয়ে এখন ছেলে আবীরই রহিম শেখের একমাত্র সংগী। ছেলের দায়িত্ববোধও প্রখর। সেও আগলে রাখে বাবাকে। মায়ের অভাব বুঝতে দেয় না বৃদ্ধ বাবাকে। রহিম শেখও ছেলে আবীরের মধ্যেই স্ত্রী লাবনীর অস্তিত্ব খোঁজার চেষ্টা করেন। এই ছেলে বিদেশে যেতে চাইছে উচ্চ শিক্ষার জন্য। ও চলে গেলে কিভাবে সময় কাটবে তার? সারা জীবন অসামাজিক রহিম শেখ কি পারবেন সামাজিক হতে? দীর্ঘ দিন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে বিশেষ যোগাযোগ রাখেননি। এখন কি তা পারবেন এই বয়সে? ভাবতে ভাবতে কখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন চেয়ারে বসেই। ছেলের চিৎকারে ঘুম ভাঙে তার।
- বাবা বাবা দ্যাখো কি পেয়েছি। আবীর কোথা থেকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে তাকে। হাতে তার মুখ খোলা একটা খাম।
- কি হয়েছে বাবা? জিজ্ঞেস করেন তিনি সোজা হয়ে বসতে বসতে।
- এই দ্যাখো ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি চিঠি পাঠিয়েছে। আমি স্কলারশিপ পেয়েছি।

রহিম শেখ ছেলেকে জড়িয়ে ধরেন শক্ত করে। বাচ্চাদের মত শব্দ করে কেঁদে উঠেন তিনি। তার দু'চোখের পানি আবীরের পিঠ ভিজিয়ে দেয়। তার এই কান্না সুখের কান্না - দু:খেরও। অনেক কিছু পাওয়ার কান্না - হারাবারও। আহ্ লাবনী যদি আজ বেঁচে থাকতো!

নারীর অধিকার

কবিতা আক্তার
সাধারণ অপারেটর
ব্যাবিলন ড্রেসেস লিমিটেড

সুখের ঘরে দুঃখের আগুন
জ্বলছে দিবানিশি,
ঘরে ঘরে নারীর কান্না
শুনছি অহর্নিশি।

পত্রিকাটার পাতায় পাতায়
খবর সর্বনাশা,
আত্মাহুতির রশিতে ঝুলছে
কত নারীর আশা।

ভালোবাসার স্বপ্ন নিয়ে
যাচ্ছে স্বামীর ঘরে,
কত নারীর স্বপ্ন ভাঙে
হৃদয় জ্বলে পুড়ে।

যৌতুক তালাক বহু বিয়ের
সকল অত্যাচার,
সইবো না আর করবো আদায়
নারীর অধিকার।

ভালবাসা কাঁদে

তাজিমুল ইসলাম
জুনিয়র সুপারভাইজার
সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড

ফুট ফুটে বনফুল মিট মিটে জোছনায়
হাসি-হাসি চাঁদপানে পিট পিটে চোখে চায়।
নিশিথিনীর সুবাসিনী বাস ছাড়ে বাতাসে
তারকারই ফুলদানী কে সাজাল আকাশে?
আলো জ্বেলে কি যে খোঁজে ঝোপঝাড়ে জোনাকী
যারে খোঁজে আজীবন পায় তার দেখা কী?
দূর থেকে ভেসে আসে কুকুরের ঘেউ ঘেউ।
মনো মাঝে বান হানে শঙ্কার শত ঢেউ।
আঁখি চায় বাতায়নে ভেজা চোখ-ম্লান মুখ,
ব্যথার পাহাড় চাপা মনে হয় এই বুক।
চাঁদ পানে চেয়ে চেয়ে খুঁজি যার মুখটি
কোথা তার ঠিকানা? ভেঙ্গে যায় বুকটি!
আঁধারের বুক চিরে কাঁদে পিউ পাপিয়া
ক্লান্তির হাই তোলে ফুল বনে জাগিয়া।
জেগে জেগে ঝরে যাবে ভোর বেলা সব ফুল
হবে নাতো মালা গাঁথা ভুল শুধু - সব ভুল।
সুন্দর ধরণীটা মনে হয় ডাস্টবিন
কত প্রেম ভালবাসা কাঁদে হেথা প্রতিদিন।
জীবনের সীমানাটা জানি নাতো কতদূর
থেমে যাবে সেইখানে বেদনার শত সুর॥

অশরীরী

প্রদীপ কুমার দত্ত
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
ওভেন টপ্‌স, ব্যাবিলন গ্রুপ

শেষ পর্যন্ত বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেলো। বাড়িটার একটা নান্দনিক সৌন্দর্য ছিল। বাড়িটার শিল্পরূপ প্রণয়নে যে শিল্পীর চিন্তাভাবনা কল্পনা প্রভৃতির সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছিল সেই নরেশ উকিলকে যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে পাক আর্মিরা গোপন আশ্রয় হতে তার দুই ছেলেসহ ধরে নিয়ে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। কেউ কেউ নরেশ উকিলের বড় ছেলে অতুল রায় সম্পর্কে রটিয়েছিল যে, সে বেঁচে আছে। তাকে এখানে ওখানে দেখা গেছে। এ সংবাদে বড় আশায় বুক বেধে বেঁচেছিলেন অতুলের মা বিভাষিনী রায়। এই পরিবারের অন্য সদস্যরা হলো ছোট দুই ছেলে রতন রায় ও নিলয় রায় আর দুই মেয়ে অনিতা ও রিতা। রতন ও নিলয় শিশু।

স্বাধীনতা উত্তর পরিবারটি চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। জেলা শহর থেকে মাত্র ২ কি: মি: দূরে তাদের বাড়ি। ছেলে দুটোকে প্রতি সন্ধ্যায় নিকটস্থ শহরে আত্মীয়ের বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। ভোর হলেই ফিরে আসে। এটাই নিত্যকার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

বাড়িতে রাতের বেলায় পুরুষ মানুষ বলতে শুধু রূপক সরকার। রূপক এই বাড়ির কেউ নয়। সে এ বাড়িতে থেকে স্থানীয় কলেজে স্নাতক শ্রেণীতে পড়ে। স্বাধীনতার পূর্বেও রূপক সরকার এ বাড়িতে থেকেই ইন্টারমিডিয়েট পড়েছে। তখন এ বাড়ির সব কিছু প্রত্যক্ষ করেছে। এ বাড়ির অনেক ঘটনাই তার স্মৃতিতে আছে। বড় দুই ছেলেসহ নরেশ বাবুর অন্তর্ধানের পর এ বাড়িটা একটা পৈশাচিক রূপ ধারণ করে।

পেশায় আইনজীবী হওয়া সত্ত্বেও বাগান পরিচর্যায় নরেশ বাবু ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাড়িটা নিজের মনের মতো করেই সাজিয়েছিলেন। বাড়ির সামনে গজ ত্রিশেক দূরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, সেখান থেকে ছোট আরেকটি রাস্তা সমকোণে বাড়ি ছুঁয়েছে। বাড়ির দক্ষিণে পুকুর পাড় ধরে প্রশস্ত সবুজ লন। উঠানের চারধারে পাকা ভিটের উপর টিনের বেড়া, টিনের চৌচালা প্রশস্ত উঁচু উঁচু ঘর। পুকুর পাড় থেকে বাড়ির ভিটিটি ঈষৎ ঢালু। বৃষ্টির পানি খুব দ্রুত সরে যায়। পুকুরের ধারে নারকেল আর সুপারি গাছের সারি। আম, আনারস, লেবুর বাগান যেমন ছিল তেমনি ছিল গোলাপ, করবী আর চাঁপায় সাজানো ফুল বাগান।

বাড়িটার নিরাপত্তা ব্যবস্থাও ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। পুকুরের চার ধারে কাঁটাতারের বেড়ার নিরাপত্তা বেষ্টনী। বাড়ির ভিটের চতুষ্পার্শ্বেও কাঁটাতারের নিরাপত্তা বেষ্টনীর সাথে দেয়াল সদৃশ মেহেদী কাঁটা গাছ। প্রতিটা ঘরের মাঝেই টিনের শক্ত ফটক। ভিতর থেকে লোহার শিকল দিয়ে আটকে থাকে এবং তালাবদ্ধ থাকে যাতে বাইরে থেকে অনায়াসে বাড়ির অন্দরমহলে কেউ প্রবেশ করতে না পারে।

মূল ঘটনায় আসা যাক। যে ঘটনার রূপক চাক্ষুস স্বাক্ষী হলেও যার কোন ব্যাখ্যা তার জানা নেই।

সে দিন মাত্র সন্ধ্যা, তখনও দিনের আলো নেভেনি। এর মধ্যে একটা শক্ত বড় মাটির ঢিল এসে পড়ে বহির্বাটির কাচারীঘরের চৌচালার উপর। কে ঢিল ছুড়ল এ সন্ধ্যায়? রূপক ভাবে। ভাবে প্রতিবেশী কেউ শত্রুতা করে ঢিল ছুড়েছে। এরপর প্রায়ই এমন করে বাইরে থেকে ঢিল আসতে থাকল। সময়ে অসময়ে ঢিলের মাত্রা বাড়তেই থাকল। কোন কারণ বোঝা যাচ্ছিল না।

এখন বাড়ির ভিতরের টিনের চালার উপর ঢিল পড়ে । এমন কি বিরামহীন বর্ষণে যখন কোথাও শুকনো মাটির লেশ নেই, তখন শুকনা মাটির ঢেলা । কি অদ্ভুত! টিনের চালায় কোন ছিদ্র নেই । কিন্তু টিনের চালা ভেদ করে ধুম করে ঘরের ভিতর শুকনো মাটির ঢেলা অথবা মাটির কলসের ভাঙ্গা চাড়া পড়ছে । এ ধরনের ঘটনা এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার । এ কাহিনী শুনে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না । যদি চাক্ষুস কেউ এমন ঘটনা দেখে তখন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায় । কেউ বলে জ্বীনের আছর, ওকে তদবীর করে দূর করতে হবে ।

একদিনের ঘটনা: অমাবস্যার অন্ধকার রাত । ছেলে দু'টো বরাবরের মতো শহরে চলে গেছে । পশ্চিমের বসত ঘরে আলো জ্বলছে, সেখানে সুভাষিনী ও তার দুই মেয়ে । রূপক পূবের ঘরে একা পড়ছে । হঠাৎ পশ্চিমের ঘর থেকে মাসীর গলা 'রূপক রূপক দেখতো বাবা ঘরের পিছনে কে?'

রূপক পশ্চিমের বসত ঘরে ঢুকে শুনতে পায় ঘরের পিছনে টিনের দেওয়াল আঁচড়ে ফর্ ফর্ ফর্ করে হাত চালিয়ে নেওয়ার এক রকম শব্দ । একবার ডান থেকে বামে আরেকবার বাম থেকে ডানে । ঢেউ তোলা টিনে যেন কোন মানুষ হাতের পরশ বুলিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে আর সাথে সাথে ফড়র ফর ফড়র ফর শব্দ তুলছে । রূপক ছেলেটা সাহসী, ভয় পাওয়ার পাত্র সে নয়। সে একটা টর্চলাইট জ্বালিয়ে জানালা খুলে এদিক সেদিক লাইটের আলো ফেলে, কেউ নেই ।

থানা পুলিশ করা হলো । পুলিশ বাড়ির অভ্যন্তরে সকল ঘর, বাগান তন্ন তন্ন করে খুঁজল । কেউ নেই ।

এরপর শুরু হল ঢিল আর ঢিল । সকালে বিকালে দুপুরে রাতে এবং ভোরে । মাসীরা ভয় পাওয়ায় রূপক এখন মাসীদের সাথে একই ঘরে থাকে । কিন্তু ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ধুম ধুম করে মাটির শুকনো ঢেলা আছড়ে পড়ে বিছানায় । আর রহস্য ভেদের এক অদম্য স্পৃহা পেয়ে বসে রূপককে । যা বাস্তব তাই সত্য । অলৌকিক কোন লোকগাঁথা বা পৌরানিক কল্পকাহিনী তাকে স্পর্শ করে না এবং প্রভাবিত করে না ।

কিন্তু বিগত কিছুদিনের অভিজ্ঞতা কাউকে বলে বুঝানো যাবে না । সে নিজেকে নিজেই শুধায় । এমন ঘটনা জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি, যা বাস্তবে বিশ্বাসযোগ্য নয় । এমন কি এ ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ না করলে রূপক নিজেও তা বিশ্বাস করতো না । ভাবতো – মিথ্যা ঘটনা বা কল্পকাহিনী ।

এমনি এক সন্ধ্যায় নিলয় শহরে যায়নি । রূপক আর নিলয় ঘরে বসে আছে । ঘরের মাচানের উপর কয়েকটা জাম্বুরা ফল রাখা আছে । হঠাৎ একটা জাম্বুরা টিনের চালে আঘাত করে নীচে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে । তারপর ওরা দুষ্টুমী করে চট দিয়ে জাম্বুরা ফলগুলো ঢেকে অশরীরী যাদুকরের প্রতি আহ্বান জানায় "দেখি এখান থেকে আর কোন জাম্বুরা নিতে পারো কিনা ।" একটু পরেই সেখান থেকে একটা জাম্বুরা টিনের চালে আঘাত করে নীচে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খায় । বেড়ে যায় কৌতুহল । আবার আহ্বান । আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি । রূপক এহেন অশরীরী, অধরা, প্রেতাত্মা, জ্বীন, পরী, ভূত, অপদার্থ – এ রকম পরিচিত শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থ খোঁজে, সংজ্ঞা খোঁজে, অবয়ব খোঁজে । কিন্তু কিছুই পায় না । অশরীরীকে চেনা যায় না, কিন্তু সকল সময় তা অনুভব করা যায় ।

আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে কবিরাজ, পীর, ফকির, সাধক ডাকা হয় । কেউ পানি পড়া দেয়, তাবিজ দেয়, অগ্নিপূজা, সূর্য পূজা, প্রেতাত্মার পূজা, পবিত্র তীর্থস্থান গয়ায় গিয়ে প্রেতাত্মার মন্দিরে পূজা পাঠিয়ে দক্ষিণা প্রদান, নবগ্রহ পূজা এতোসব প্রতিবিধান আসতে থাকে প্রতিকারের জন্য । একটার পর একটা ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠান চলতে থাকে । নানাজন অযাচিত পরামর্শ দিয়ে মাসীর কাছ থেকে নারকেল, কুমড়া, টাকা পয়সাও নিয়ে যায় । আস্তে আস্তে অশরীরী যাদুকরের প্রকোপ কমে আসে এবং এক সময় পুরোপুরি থেমে যায় । একইসাথে মরে যায় সব কলা গাছ, শুকিয়ে যায় লেবু গাছ । নারকেল, আনারস, সুপারী সবই আস্তে আস্তে নিস্প্রাণ নিস্তেজ হয়ে শুকিয়ে গেল । কিন্তু ভেদ করা গেল না অশরীরীর রহস্য ।

স্মৃতির অ্যালবামে

মোঃ নুর-আলম
সিনিয়র অফিসার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

"পঞ্চগড় জেলায় বাড়ি আমার
গ্রাম ইসলাম পুর,
কষ্টে চলতো বাবার সংসার
অভাব হয়না দুর ।"

অভাবের সংসারে অনেক কষ্টে বড় হই । বাবার বড় ছেলে হওয়ার কারণে লেখাপড়া ছেড়ে সংসারের হাল ধরতে হয় । কি করবো কিভাবে আয় করে সংসার চালাতে সাহায্য করব, সব সময় এ নিয়ে ভাবতাম । একদিন আমাদের পাশের বাড়ির এক ভাইয়ের মাধ্যমে জানতে পেলাম তেঁতুলিয়া থানায় দর্জি বিজ্ঞান কলেজের কথা । সেখানে দর্জি কাজের প্রশিক্ষণ নেই । এরপর একটি দর্জি দোকানে ১৩ মাস সহকারী হিসাবে কাজ করি । মোটামুটি কাজ শেখার পর গ্রামে একটি দর্জি দোকান দেই। গ্রামের দোকানের আয় দিয়ে ভালোভাবে সংসার চলে না । এর পরে ঢাকায় গার্মেন্টসে আসার সিদ্ধান্ত নেই । তবে ঢাকায় পরিচিত কেউ নেই । পরবর্তীতে এক দুর সম্পর্কের চাচার খবর পেয়ে তার কাছে আসি । ১৯৯০ সালের জুলাই-এর ১৯ তারিখে চাচার মাধ্যমে এপ্লিক ফ্যাশন গার্মেন্টস-এ তিনশত টাকার বেতনে সহকারী হিসাবে যোগদান করি । এখানে আয় কম, ব্যয় ছিল অনেক বেশি । মূল বেতন এবং অতিরিক্ত আয়সহ মাসিক আয় চারশত ত্রিশ থেকে চারশত পঞ্চাশ টাকা । কিন্তু আমার সিট ভাড়া দুইশত টাকা এবং খাওয়া খরচ ছিল তিনশত টাকা । মাসের শেষে পঞ্চাশ টাকা ঘাটতি পড়তো । তাই ছুটির পর বাসায় অন্যান্য কাজ করতে হত । এইভাবে কেটে যায় ছয় মাস ।

একদিন মনডস এ্যাপারেল লিমিটেড-এর এক আয়রন ম্যানের সাথে কথা বলে সুইং আয়রনম্যান হিসেবে চাকরি নিলাম । বেতন ধরল ছয়শত পঞ্চাশ টাকা । এই বেতনে আমার অনেকটা আশা জাগলো যে সেখানে কাজ করব । এ দিকে আমার কষ্টের কথা শুনে বাবা-মা ছাগল বিক্রি করে চারশত টাকা পাঠিয়ে দেয় । আমি সেই টাকা খরচ না করে আরও একশত টাকা যোগ করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেই । এভাবেই চলছিলো, কিন্তু এখানেই শেষ নয় ।

আমাকে মেশিন চালানো শিখতে হবে । তাই অপারেটরদের সংগে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেই । ওদের জন্য বাদাম ছোলা নিয়ে আসি । ওরা আমাকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে মেশিন চালানো শেখায় । ছয়মাস গত হবার পর মনে একটা সাহস হলো যে আমি অন্য ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে পারবো । যেটুকু ভয় ছিল ছুটির দিনে অন্য ফ্যাক্টরিতে ইন্টারভিউ দিতে দিতে ভয়টা কাটিয়ে উঠি । পরে ইউনাইটেড গার্মেন্টসে অপারেটর হিসাবে চাকরি নেই । এক হাজার টাকা বেতন । সেখানে চাকরির বয়স ছয় মাস চলা অবস্থায় এন এন গার্মেন্টস-এর গেটে অপারেটর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখতে পাই । ছুটির দিন ইন্টারভিউ দিলাম, চাকরি হয়ে গেল । সেখানে জ্যাকেটের কাজ চলতো, বেতন তেরশত পঞ্চাশ টাকা । প্রতিদিন ছুটি হতো রাত দশটায় । মাসিক ছুটি ছিল দুই দিন ।

এভাবেই চলে দুইটি বছর । এরপর চাকরি নিলাম লেডিস গার্মেন্টসে, সেখানে নীটের কাজ চলতো, Flat Lock মেশিনের অপারেটর ছিলাম । আঠার মাস কাজ করার পর মাম গার্মেন্টসে স্যাম্পলম্যান হিসাবে চাকরি নিলাম । সেটা ছিল মিরপুর ৭নং সেকশনে। এখানে ব্যাবিলনের কাজ সাব-কন্ট্রাক্ট হিসাবে করা হত । এক দিন পিএম স্যার একটি সার্ট আমাকে দিয়ে বললেন এটা ব্যাবিলনের স্যাম্পল । কোয়ালিটির দিক থেকে কোন ছাড় নেই । এটা অবশ্যই ১০০% কোয়ালিটি সম্মত হতে হবে । স্যাম্পল হাতে নিয়ে দেখি সব কিছু - Matching এমন কি Sleeve Placketও Matching । স্যাম্পল তৈরি ভালভাবে করলাম । ব্যাবিলনের কাজ দেখে, অন্যের মুখে সুনাম শুনে আমার ইচ্ছা জাগে ব্যাবিলনের স্যাম্পলম্যান হব । কিন্তু সে আশা তখন পূরণ হয়না ।

যা হোক সে সব কথা, মাম গার্মেন্টস থেকে চাকরি ছেড়ে দিলাম। কারণ ঠিকমতো বেতন দেয় না। তিন মাস পরে মেডলার গার্মেন্টসে স্যাম্পলম্যান হিসাবে চাকরি নিলাম। সেখানে নিয়ম কানুন ভালই ছিল, তাই ছয় বছর চাকরি করি। কিন্তু কোন পদোন্নতি হয়নি। আমার ইচ্ছা আমি প্যাটার্ন মাস্টার হবো। এরই মধ্যে আমার অনেক বন্ধু হয়। একজন বন্ধু ভারটেক্স গার্মেন্টসের স্যাম্পলম্যান। সে আমার কথা প্যাটার্ন মাস্টারের সাথে গল্প করত। সেই মাস্টার আমার পদোন্নতির আশা দিয়ে স্যাম্পলম্যানের চাকরি দেয়। তিন বছর পর আমাকে প্যাটার্ন মাস্টারের পদ দেয়। সেখানে আরো দুই বছর চাকরি করার পর আমার বাতজ্বর হয়। দুই মাস আমি নিয়মিত অফিস করতে পারিনি। তাই আমার জায়গায় আর একজন প্যাটার্ন মাস্টার নিয়োগ দেওয়া হয়। এরপর আমি সেখান থেকে এসে অন্য আরেক গার্মেন্টসে প্যাটার্ন মাস্টার হিসাবে যোগদান করি। সেখানের এম,ডি, স্যার খুব ভয়ঙ্কর লোক ছিলেন, যখন তখন কর্মীদের গায়ে হাত তুলতেন এবং খারাপ ভাষায় গালাগাল করতেন। খুব ভয়ে থাকতাম আর চাকরি খুঁজতাম। এক সময় সন্ধান পেলাম এ প্লাস গার্মেন্টসে প্যাটার্ন মাস্টার নিবে। সেখানে ইন্টারভিউ দিলাম। চেয়ারম্যান স্যারের সে কি প্রশ্ন! কিভাবে গার্মেন্টস জগতে এলাম, কোথায় কি কি কাজ করেছি, প্যাটার্ন মাস্টার কত দিন ছিলাম, সর্বশেষ বললেন কবে এখানে যোগদান করবে? আমি বললাম বেতনটা পেলে চলে আসবো। বেতন আজ দেয় কাল দেয় এই করে পঁচিশ তারিখে দিল। পরের দিন এ প্লাস-এ যোগদান করলাম।

সেখানে ভালোভাবে চলছিল আমার স্যাম্পল সেকশন। এম,ডি, স্যারের দায়িত্বে ছিলেন আর একজন পি,এম, স্যার। তার নাম শাহজাহান। তিনি ব্যাবিলন থেকে এসে এ প্লাস-এর নিয়ম কানুনে কিছুটা পরিবর্তন আনেন। শাহজাহান স্যার চলে যাওয়ার পর একজন নতুন জি,এম, স্যার যোগদান করেন। তিনি নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে পুরাতন ইনচার্জ, সুপারভাইজার বাদ দিয়ে নতুন করে নিয়োগ দেন। একদিন নতুন একটা স্টাইলের কাজ লাইনে ইনপুট হয় কিন্তু যে রকম আউটপুট হওয়ার কথা সে রকম হয় না। কারণ কোন্ অপারেটর কোন্ কাজ ভাল পারে নতুন সুপারভাইজার, ইনচার্জ বুঝতে পারে না। মেশিনের লে-আউট ঠিক মতো করতে পারে না। এম,ডি, স্যার আমাকে ডেকে বললেন আলম প্রডাকশনের অবস্থা ভালো না। আমি দেখি লাইনের প্রডাকশন পনের থেকে বিশ পিস্ ঘন্টায়। আমি নতুন করে লেআউট করি এবং যে যেই কাজে পারদর্শী তাকে সেই মেশিনের কাজ দেই। ফলে প্রডাকশন বাড়তে থাকে ৬০ থেকে ৭০ পিস্ পর্যন্ত। এরপর থেকে জি,এম, স্যার আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করেন। আমি বিষয়টি এম,ডি, স্যারকে জানাই। তিনি বলেন ধৈর্য ধরো, সবুরে মেওয়া ফলে। কিন্তু সে মেওয়া আর সেখানে ফললোনা, কারণ বিধাতা ভাগ্য লিখে রেখেছিল ব্যাবিলনে।

জানতে পারলাম ব্যাবিলনে প্যাটার্ন মাস্টার নিবে। এ কথা শুনে আমি ব্যাবিলনে আসি এবং ইন্টারভিউ দেই। আর ২০০৮ সালের ৭ই নভেম্বর প্যাটার্ন মাস্টার হিসাবে যোগদান করি। ভালভাবে আজও কাজ করে যাচ্ছি। বিগত জায়গার কাজের সমস্যাগুলি এখানে নেই। নেই কোন গালি-গালাজ, নেই বেতনের কোন সমস্যা। ব্যাবিলনে আসার আগে আমি কম্পিউটার তেমন ভালো চালাতে পারতাম না। ক্যাডের কাজ জানতাম না। এখানে প্যাটার্ন ইনচার্জ ডালিয়া ম্যাডাম-এর মাধ্যমে কম্পিউটার চালানো ও ক্যাডের কাজ শিখতে পেরেছি। আমি তার অবদান কখনোই ভুলতে পারবো না। আমি আশা করি বাকি জীবন তার আদর্শে ব্যাবিলনে কাটিয়ে দিব।

সব শেষে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলি, আমি কোন কবি নই, নই কোন লেখক তবুও ব্যাবিলন কথকতায় আমার লেখা একটি কবিতা "মেঘের মেয়ে বৃষ্টি" প্রকাশিত হয়েছে। আমি খুবই আনন্দিত যে আমার জীবনের কিছুটা অংশ আজ তুলে ধরতে পেরেছি ব্যাবিলন কথকতার মাধ্যমে। ৪র্থ সংখ্যায় আমার কবিতা ছাপা হয়েছিল। সেই সংখ্যাটির মোড়ক উন্মোচন করেছিলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক। ঐ দিন শামসুল হক স্যার তার বক্তৃতায় বলেছিলেন যাদের লেখা ছাপা হয়েছে তাদেরকে নিয়ে একটা কর্মশালা পরিচালনা করতে চান। আর ঐ কর্মশালায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল শুধুমাত্র ব্যাবিলনের কর্মী হিসাবে। আমি এই কর্মশালা থেকে অনেক কিছু শিখেছি এবং এটা আমি সারাজীবন মনে রাখব।

২০০৮ সালের ১৭ই নভেম্বর ভোর ০৭.০০টা

মোঃ আবুল বাশার
ডেপুটি ম্যানেজার, এইচআরডি এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স
ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিমিটেড

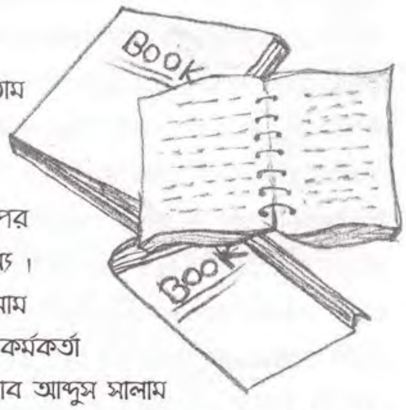

আজ নয়-সেই ষোল বছর আগের কথা। যখন ছিলাম আমি অতি তরুণ এক যুবক। সময়টা কাটছিল টিউশন করে। ঢাকাতে ছিলাম বোনের বাসায়। যে ছাত্রকে আমি পড়াতাম সে ছাত্রের বাবা একদিন আমাকে বললেন, আমি চাকরি করব কিনা। তার পরিচিত এক লোক আছে। আমি বললাম চাকরি পেলে তো অবশ্যই চাকরি করবো। সত্যি সত্যি তিনি একদিন তার সেই পরিচিত লোকের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, ২০-০৬-১৯৯৫ইং তারিখে তার সাথে অফিসে দেখা করার জন্য। অবশ্য তারই সূত্র ধরে আমি প্রথমে পা রেখেছিলাম ব্যাবিলনের একটি ফ্যাক্টরিতে যার নাম "ল্যাপিন ড্রেসেস"। যার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন তিনি-ই ছিলেন ওখানকার একজন কর্মকর্তা মিঃ কাইয়ুম অর্থাৎ আমার সাবেক বস্। প্রথমে এসেই আমার শ্রদ্ধাভাজন পরিচালক জনাব আব্দুস সালাম স্যারের সাথে দেখা হয়। তিনি আমাকে মৌখিকভাবে কিছু প্রশ্ন করেন এবং আমাকে কাজে যোগদানের সুযোগ করে দেন। বলতে গেলে সালাম স্যারের কাছেই আমার হাতে খড়ি। প্রতিদিনই কিছু না কিছু শিখতে হতো সালাম স্যারের কাছ থেকে। অবশ্য আমিও ছিলাম নাছোড়বান্দা। যা একবার দেখতাম বা শুনতাম তাই আঁকড়ে ধরতাম। এরপর ২০০০ সালে ব্যাবিলনের মেইন বিল্ডিং-এ চলে আসি। বেশ ভালোই কাটছিল প্রায় সাতটি বছর। হঠাৎ আমি জানতে পারলাম, আমার আর কাজ করা হচ্ছেনা এখানে। কেমন যেন আঁতকে উঠলাম! মনে মনে ভাবতে লাগলাম হয়তো আমি অযোগ্য। কিন্তু না, পরে জানতে পারলাম ব্যাবিলনের আরও একটি প্রজেক্ট চালু হতে যাচ্ছে হেমায়েতপুরে। সেখানেই যেতে হবে এবং সেই প্রজেক্টের পুরো এইচআর-এর দায়িত্বটাও নিতে হবে আমাকে। আমি কি পারব? তবে মনে প্রাণে অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং সৎসাহস ছিল প্রচুর, আমি পারব।

২০০২ সালের কথা। আমি ব্যাবিলন গার্মেন্টস ছেড়ে চলে আসি হেমায়েতপুরের নতুন প্রজেক্টে যার নাম অবনী নীটওয়্যার লিঃ। সেখানে এসে শুধু মাননীয় পরিচালক জনাব আব্দুস সালাম স্যারের সহযোগিতাই নয়, ব্যাবিলন গ্রুপের অতিপ্রিয় মাননীয় পরিচালক জনাব এস.এম, এমদাদুল ইসলাম স্যারের সাহচর্যও পাই। বলতে গেলে কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত পুরো ধারণাটাই শিখতে পেরেছি এমদাদ স্যারের কাছ থেকে। এমদাদ স্যারের প্রতিটি কথার মাঝে এত চমৎকার একটা আর্ট যা সহজে আর কারও মাঝে খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল। শুধু এমদাদ স্যার নয়, মাননীয় পরিচালক জনাব আবিদ স্যারের কাছ থেকেও কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। সালাম স্যার, এমদাদ স্যার, নেসার স্যার ও আবিদ স্যারের সহযোগিতায় অবনী নীট ওয়্যার লিঃ একটু একটু করে অনেক বড় একটা প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। বেশ সুনাম ও দক্ষতার সাথে দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। হঠাৎ করে আমার জীবনে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নিয়ে এল শ্রমিকদের টিফিন অর্থাৎ কেক, কলা, রুটি। আমি সবসময়ই শ্রমিকদের সমস্যাগুলো আগ্রহভরে শুনতাম এবং এর দ্রুত সমাধান দেয়ার চেষ্টা করতাম। একদিন কিছু শ্রমিক আমাকে বলে, "স্যার, দেখেন তো এই রুটি, কলা কি খাওয়া সম্ভব?" আমি দেখলাম আসলেই এটা খাওয়ার অযোগ্য। ওদের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে জবাবে তারা বলে, "আমরা টিফিন কিনতে গেলে এখানকার স্থানীয় সেলিম, মাসুদ এবং ওদের সাথে আরও ৩/৪ জন আমাদের জোর করে এগুলো ধরিয়ে দেয়।" এভাবে ২/৩ দিন ঘটার পর আমি তাদের সাথে কথা বলি, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি এ ব্যাপারটি নিয়ে আমার পরিচালক স্যারদের সাথে আলোচনা করি। এক পর্যায়ে সালাম স্যারের পরামর্শ অনুযায়ী একটি বেকারির সাথে চুক্তি করা হয়, তারা প্রতিদিন যেন আমাদের ফ্যাক্টরিতে টিফিন দিয়ে যায়। উক্ত খবর জানার পর স্থানীয় কেক, কলা বিক্রেতারা আমার উপর ক্ষিপ্ত হয় এবং ঐ দিন সন্ধ্যার পর আমার অফিসের একজন এইচআরডি অফিসারকে ইটের ভাটায় নিয়ে বেশ মারধর করে। উক্ত খবর শুনে সঙ্গে

সঙ্গে টহলরত পুলিশ আসে। পুলিশ এ ব্যাপারটির মীমাংসা করার জন্য এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি নাজিম উদ্দীন-এর সাথে আলোচনায় বসেন। কিন্তু নাজিম উদ্দীন মীমাংসা করতে রাজি হননি। বোধহয় তিনি চাননি যে ব্যাপারটি ঐ সময়েই সমাধান হয়ে যাক।

২০০৮ সালের ১৭ই নভেম্বর। খুব ভোরে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি। ভাবলাম অফিসে যাবার আগে আহত এইচআর অফিসারকে একবার দেখে যাই। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে মোবাইল করলে তার স্ত্রী মোবাইল রিসিভ করে জানায় সে ঘুমাচ্ছে। তাই আর যাওয়া হলো না। রিকশাটা ঘুরিয়ে অফিসের দিকে রওয়ানা হই। তখন সম্ভবত সকাল ৭.০০টা বাজে। রাস্তাঘাট কিছুটা হলেও জনশূন্য। পলো গার্মেন্টস-এর সামনে পৌঁছালে হঠাৎ একটা প্রাইভেট কারে চার/পাঁচ জন লোক এসে আমার রিকশা ঘেরাও করে। আমি কিছু জানার চেষ্টা না করে দৌড় দেই। তখনকার রাস্তাঘাট আজকের দিনের মতো এত উন্নত না থাকায় আমি দৌড়ে বেশি দুর যেতে পারিনি, বালির মধ্যে পা আটকে পড়ে যাই। আর ঠিক তখনই ওরা আমাকে এতটাই আঘাত করে যে প্রত্যেকটি আঘাতই আমার মাথায় পড়ে। আমি হাত দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে আমার হাতের উপর আঘাত পড়ে এতে আমার ডান হাতের দুটো আঙ্গুল ভেঙ্গে যায় এবং আমি গুরুতর আহত হই। একটা পর্যায়ে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয় যে আর একটি মাত্র আঘাত আমার মাথায় পড়লে আমি মারা যাব। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমত তারা আরও একটি আঘাত করবে ভেবেও কেন যেন করেনি। তারা আমাকে মৃত ভেবে সেখান থেকে চলে যায়। আমার শরীরের সব রক্ত অঝোরে ঝরছে। ততক্ষণে দু'একজন করে অফিসে আসতে শুরু করেছে। আমাকে এ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আমার অফিসের লোকজন আমাকে রিকশায় তুলল। আমি ঐ মুহূর্তে এতটাই তৃষ্ণার্ত ছিলাম যে মনে হচ্ছিল যদি আমি একটু পানি পান করতে না পারি তাহলে হয়তো আর বাঁচবো না। আমি শুধু একবার বললাম পানি! দ্রুত আমাকে পানির ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এরপর আমাকে সাভারে অবস্থিত এনাম মেডিকেলে ভর্তি করানো হয়। মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ে। সকল শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাগণ রাস্তায় একত্রে জড়ো হয়ে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিচার চাইলে এখানকার স্থানীয় লোকজন জড়ো হয়ে ঐ সকল শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের উপর হামলা চালায়। এতে অনেক শ্রমিক আহত হয়। এই খবর পেয়ে সেখানে সাংবাদিক আসতেও বেশি দেরি করেননি। সাংবাদিকগণ উক্ত কর্মকান্ডের গভীর নিন্দা জানিয়ে খবর লিখেন বিভিন্ন পত্রিকাতে। কিছুক্ষণ পরে আমাকে হাসপাতালে রেখে সবাই চলে আসতে থাকে কারণ সবারইতো কাজের তাড়া। আমি নিঃসঙ্গ হয়ে যাব ভেবে সবশেষে যে আমার কাছ থেকে চলে যাবে আমার অতি কাছের একটি লোক যে কিনা এখন ট্রেন্ডজ-২-এর ফ্যাক্টরি ম্যানেজার ফিরোজ সাহেব, আমি তার হাত চেপে ধরে তাকে হাত দিয়ে ইশারা করলাম আমাকে একা ফেলে রেখে না যাওয়ার জন্য। প্রথমে আমাকে যে ডাক্তার দেখেছেন তিনি বললেন, "ইস! এভাবে কি কেউ কাউকে মারতে পারে?" সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, দুর্ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটাই আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন ব্যাবিলন গ্রুপের প্রতিটি ব্যক্তিই আমার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করেন। যাতে আমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আবার তাদের মাঝে ফিরে আসি। আমি কখনও ভাবতে পারিনি এত ভালোবাসে ওরা আমাকে। আমার জন্য ওদের এত ভালবাসা আমি কোনদিন ভুলবোনা। মাননীয় পরিচালকবৃন্দ আমার প্রতি এত খেয়াল রেখেছেন যার পরিমাপ আমি করতে পারবো না। আমার চিকিৎসা বাবদ প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ হয়েছে যার পুরোটাই ব্যাবিলন গ্রুপের মাননীয় পরিচালকবৃন্দ বহন করেছেন। আমি ঋণী এই প্রতিষ্ঠানের কাছে, এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে, যাদের অসম্ভব ভালোবাসা ও আন্তরিকতায় আমি আজও বেঁচে আছি। আজও আছি আমি ব্যাবিলন গ্রুপে একজন আদর্শ ও সৎকর্মী হিসেবে। সেই দিনটি আমার স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে থাকবে আমার জীবনের বাকী দিনগুলোতেও। সেই দিনটির কথা শত ভুলতে চাইলেও সম্ভব নয় কারণ সেই ব্যথা আজও আমায় মনে করিয়ে দেয় সেদিনের কথা। ব্যাবিলনের ত্যাগ, মহীমাকে আমি ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবোনা। ব্যাবিলনকে জানাই আমার শ্রদ্ধাভরা শত কোটি সালাম।

I Hate সিগারেট

রাবেয়া খাতুন
অফিসার, প্যাটার্ন
ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

বাংলাদেশ নদীমাতৃক এবং কৃষি প্রধান দেশ। তাইতো মাছে ভাতে বাঙালি। স্নেহময়ী মায়ের হাতের কাঁচা মটরশুটির খিচুড়ির সংগে ইলিশ মাছ ভাজা পেলে কে-ই বা সাত দিনের অভুক্তর ভান না ধরবে? ঠিক আরো একটি মজার খাবার সবার প্রিয় চিনা বাদাম। গ্রীষ্মের পড়ন্ত বিকেলে কোনো গাছের নিচে বসে কিংবা মাঠের মধ্যে কাঁচা ঘাসের উপর বসে যদি বন্ধুর সংগে ঝগড়া কিংবা কথা কাটাকাটি হয়ে যায়, তৃতীয় পক্ষ এই চিনাবাদাম-ই যেন সব বিবাদ মিটিয়ে বন্ধুকে আরো নিবিড় করে দেয়। এ সব মুহূর্তে বাদাম না হলে যেন সব কিছুই অপূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জানেন? ব্যতিক্রম এই আমি- কোনটাই খেতে পারিনা। কারণ এর গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না। তাহলে কি ভাবছেন আমি দুর্গন্ধ পছন্দ করি? না! দুর্গন্ধ থেকে দুরে থাকতে পাগলও চেষ্টা করে। সুস্থ মানুষতো বটেই। বিভিন্নভাবে দুর্গন্ধ আমরা এড়িয়ে থাকি। যেমন ঘামের গন্ধ এড়াতে পারফিউম ব্যবহার করি। ছেলেরা পায়ে পাউডার মেখে, জুতোর মধ্যে সামান্য পাউডার ছিটিয়ে জুতোটা দুর্গন্ধমুক্ত রাখে। চলার পথে ডাস্টবিনের কাছে এসে পড়লে নাকে কাপড় দিয়ে সেটাকে অতিক্রম করা যায়। এভাবে বিভিন্ন দুর্গন্ধকে এড়িয়ে থাকতে পারি। কিন্তু এড়াতে পারিনা সেই দুর্ধর্ষ দুবৃত্ত মহাশত্রুকে। এ যেন সারাক্ষণ তাড়া করে ফেরে। সে হলো একটা সিগারেট। সর্বক্ষণ সর্বস্তরে তার বিচরণ। বাসায়, অফিসে, গাড়িতে, রিকশায় এমনকি পায়ে হাঁটার পথেও সামনে কেউ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দিব্বি হেঁটে যাচ্ছে। অসহ্য গন্ধ! অথচ কিছুই বলার নেই। যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

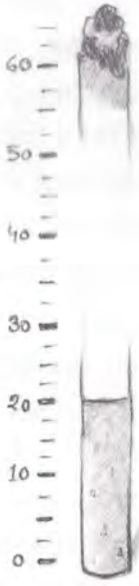

একবার ঈদের ছুটিতে বাসে করে বাড়িতে যাচ্ছি, প্রায় ৮ ঘন্টার জার্নি। বাসের ইঞ্জিনের গন্ধটাও জার্নিতে আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। আরিচা পৌঁছাতেই কয়েক বার বমি হয়ে গেল। খুবই খারাপ লাগছে। অসহ্য কষ্ট, মনে হচ্ছিল সেখান থেকে ফিরে আসি। কিন্তু পারিনি কারণ বাড়ি যাওয়ার আনন্দ-ই আমাকে কষ্ট সহ্য করতে সাহায্য করেছে। গাড়িটা যখন ফেরিতে উঠলো বন্ধ নিঃশ্বাসটা মুক্ত আকাশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একে একে সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। নদী থেকে উঠে আসা হিমেল হাওয়া সবাইকে শীতল করে দিল। গাড়ি যখন ওপারে পৌঁছে গেল, এরই মধ্যে কেউ কেউ উষ্ণতা ফিরে পেতে একটা করে সিগারেট ধরিয়ে গাড়িতে উঠলো। মনে হলো ওরা যাত্রী নয় যেন একদল ডাকাত। আমার মাথা ব্যথা আরো বেড়ে গেল। গাড়ি চলছে, সিগারেট টানছে, প্রত্যেকটি সিগারেটের ধোঁয়া বাতাস বেয়ে এসে যেন শত্রু ভেবে আমাকেই আক্রমণ করছে। খুবই খারাপ লাগছে। একটা সময় সহ্য করতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম ভাই আপনারা সিগারেট খাবেন না, আমার খুব খারাপ লাগছে প্লিজ সিগারেটটা ফেলে দিন। সবাই আমার দিকে তাকিয়ে। কেউ চট করে সিগারেটটা মুঠাবৃত করলো। কেউ আবার মুচকি হাসলো। সিটে মাথা গুজে ভাবছি ওরা কেন আমার কথায় হাসলো? তাহলে কি আমাকে ক্যানভাসারদের মতো মনে হলো? মাথাব্যথার সংগে একটা লজ্জাবোধ কষ্টটা আরো বাড়িয়ে দিল।

আমি একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সিগারেটে কতটা ক্ষতি আর কতটা উপকার আছে। তিনি বলেছিলেন এটা একটা নেশা আর ক্ষতি পুরোটাই। যেমন ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, বুকের যন্ত্রণা, আরও মারাত্মক রোগ হতে পারে সিগারেট থেকে। একটা সিগারেট পানে পাঁচ মিনিটের আয়ু কমে। ডাক্তারের কথাগুলি শুনে ভেবেছি দেশের জন্য নয় মানুষের জন্য কিছু করতে হবে। অনেকভাবে চিন্তা করেছি কিভাবে বোঝানো যায় ধুমপানে কতটা ক্ষতি। এক সময় মাথায় এলো মোবাইলে এসএমএস করা যেতে পারে। মোবাইলে ১০টি নাম্বার তৈরি করে ১টি করে এসএমএস করলাম। অল্প কথায় লিখলাম Smoking is a very bad habit. Abstain from narcotics. Look after the body well. A weak body is a curse. বেশ কিছুদিন কেটে গেল কোন সাড়া পেলাম না। বুঝতে পারলাম এভাবে হবে না। আসলে উচিৎ নিজের ঘরকে সামলিয়ে পরকে

বলা। কিন্তু আমার তিনটি ভাই আমার স্বামী কেউ ধুমপান করে না। হঠাৎ মাথায় এলো এরপর সবচেয়ে আপন আমার অফিস। যাদের সংগে দিনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দেই। আমি তাদেরকে কথাগুলি বলতে পারি। গার্মেন্টস জগতে ব্যাবিলন সব সময় একটু ব্যতিক্রম। ভালো কিছু নিয়ম নীতি তৈরির দাবিদার। তার-ই ছোট একটি নিদর্শন স্টাফদের জন্য দু'বেলা চায়ের ব্যবস্থা। বিকেলে আছরের নামাজের পর সবাই চায়ের টেবিলে উপস্থিত। ১০ থেকে ১৫ মিনিটের এই আড্ডা যেন মান্নাদে'র কফি হাউজ। সবাইকে এক জায়গায় করে কিছু বলার মতো দারুণ সুযোগ। প্রথমে আমার সহকর্মীদের মধ্যে চিহ্নিত করলাম কে কে ধুমপান করে। খুঁজে পেলাম রাজি, শাহিন, ছালাম, সোলায়মান, রানা ভাইকে। ওরা সবাই আমার ভাই। আমি বয়সে কারো বড় কারো ছোট, তবু সবাই আমাকে বড় বোনের মতো দেখে। আর সে সুবাদে আমি ওদের ধুমপান না করার জন্য পরামর্শ দিতে শুরু করলাম। প্রতিদিন নানানভাবে বলতে থাকি। কখনো বা খবরদারি করি। ওরা রাগ করে না কিংবা হেসেও উড়িয়ে দেয় না। নীরবে কথাগুলি শুনে শুধু বলে আপনার কথা রাখবো, অতিশীঘ্রই সিগারেট ছেড়ে দেব। কিন্তু আবার ওরা সিগারেট খায়। আমি বললাম আপনারা জানেন ১ শলা সিগারেটে রয়েছে ১৫ বিলিয়ন বিভিন্ন উপাদান। তার মধ্যে বেনজোপাইরিন, আর্সেনিক এবং তামাক মানবদেহে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার জন্য দায়ী। কেন এই মরণব্যাধি টেনে আনবেন? প্লিজ ছেড়ে দিন এই বিষপান। একটা সময় আমাকে কথা দিয়ে বলল ঠিক আছে আপা আপনার কথা রাখলাম। দৃঢ়তার সংগে বলল আগামী ১ তারিখ থেকে সিগারেট খাবো না এই প্রতিজ্ঞা করলাম। ঢাকা শহরে ব্যাচেলর ছেলে মেয়েরা মেসে বা হোটেলে সাধারণত: মাস চুক্তিতে খায়। সিগারেটের কোন মাস চুক্তির নিয়ম আছে কিনা আমার জানা নেই। আর জানতেও চাইনা। আমি শুধু চাই এই বিষপান থেকে চুক্তিবদ্ধতা আজই শেষ করুক আর প্রতিজ্ঞাবদ্ধতায় চুক্তি করুক সারা জীবনের জন্য।

একটা সময় ব্যাবিলনের কর্মীরা লুকিয়ে বাথরুমে সিগারেট খেত। বরাবরই ব্যাবিলনের অভ্যন্তরে কোন অনাকাঙ্খিত ও অসংগতিপূর্ণ ঘটনা ঘটলে সেখানে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যদি মনে করেছে আগাছা তবে সেটা উপড়ে ফেলেছে। আর যদি মনে করেছে এটা ফলজ তাহলে সেটাকে পরিচর্যা করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বাথরুমে ধুমপায়ীদের চিহ্নিত করেছে। ধুমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেয়ালে পোস্টার লাগিয়ে দিয়েছে। পোস্টারে লেখা আছে 'ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে ধুমপান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ'। আর ছাদের উপর একটা ছোট্ট ঘর বানিয়ে দিয়েছে। ঘরটার নাম দিয়েছে Smoking Zone। সেটা ছিল শুধু ম্যানেজার স্যারদের জন্য। কিন্তু ওনারা বড় মানুষ, মহৎ হৃদয়, আকাশের মতো বিশাল মন। ভ্রাতৃত্ববোধ সেটা তো আল্লাহর দান। তাইতো ছোট ভাইদেরকে ছেড়ে দিয়ে বড়রা খোলা জায়গায় ধুমপান করেন। এ যেন ভ্রাতৃত্ববোধের প্রকাশ।

একদিন কোন কাজে ঘরটার কাছে গেলাম। উকি মেরে দেখলাম কয়েকজন অপারেটর সিগারেট খাচ্ছে। আমি একটু ধমকের স্বরে বললাম এই ছেলেরা সিগারেট খাচ্ছেন কেন? চট করে হাতটা পিছনে লুকিয়ে মাথা নিচু করলো ওরা। আমি তখন নরম স্বরে বললাম ভাই আপনারা সিগারেট খাবেন না। এটা ক্ষতিকারক। তামাকের ভিতরে এক ধরনের উপাদান আছে সেটা হলো কার্বনমনোক্সাইড যা রক্ত থেকে অক্সিজেন দূর করে দেয়। শরীরের ভিতরে অক্সিজেন না থাকলে মানুষ বাঁচে? তাছাড়া ধুমপান চোখের ও নাকের ক্ষতিসাধন করে এবং মনকে অস্থির করে তোলে। আপনাদের কাজ করতে সমস্যা হবে। ছেলেগুলি সিগারেট ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল ম্যাডাম এসব কথা আমরা বুঝবোনা। ঐ দেখেন বড় স্যারেরা, ওনাদেরকে বলেন। কথাটা বলে দে ছুট। ওদের কান্ড দেখে খুব হাসি পেল। তারপর পিছন ফিরে ওদের আঙুলটা তীরের মতো সোজা করে দেখিয়ে দেওয়া স্থানটির দিকে তাকালাম। দেখলাম আমাদের হেড অফিসের কয়েকজন স্যার। তাদেরকে কিছু বলার সাহস আমার হয়নি। যদিও আমি সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ভাল জানি এবং শ্রদ্ধা করি। তাদের পোশাক পরিধান, বাচনভঙ্গি, ভাষার স্বচ্ছতা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। আর চলার গতি? সেতো কাজী নজরুলের 'ওরা উদ্দাম ওরা.... বিধাতার মতো নির্ভয়'। সত্যিই ব্যাবিলনের একটা বলিষ্ঠ টিম। ভাবতেই খারাপ লাগে সামান্য একটা সিগারেট পানে কমে যাবে সেই উদ্দামতা। কারণ সিগারেটের নিকোটিন রক্তকোষগুলো সংকুচিত করে ফেলে। ফলে রক্ত ও অক্সিজেন প্রবাহে বিঘ্ন ঘটায়। হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। একটা সময় আস্তে আস্তে দেহটা মুষড়ে পড়ে। আমি ওনাদের কারো কারো বেবি দেখেছি। অত্যন্ত মিষ্টি চেহারা-যেন চাঁদ মুখ। তাদের কপালে একটি চুমু দিলে পৃথিবীর সমস্ত নেশা-ক্ষুধা-তৃষ্ণা মুহূর্তের মধ্যে নিবারণ হয়ে যায়।

আমি হলফ করে বলতে পারি এই বাচ্চারা বড় হয়ে একদিন বলবে 'বাবা তুমি আর সিগারেট খেওনা ।' ততোদিনে হয়তো তার ফুসফুসের মধ্যে বাদামী ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে । (আল্লাহ না করুন) সেটা ক্যান্সারের আশঙ্কা! উল্লেখ্য আমার বয়স যখন চার বছর তখন ধুমপানে ক্যান্সার কেড়ে নিয়েছে আমার বাবাকে ।
বর্তমানে ব্যাবিলনের সেই Smoking Zone ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । জানিনা এর পুনর্নির্মাণ হবে কিনা । ভারাক্রান্ত মন আমার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাউকে বোঝাতে পারিনা ।

একদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরছি হঠাৎ মোবাইলে রিং টোন । রিসিভ করে হ্যালো বলতেই ও দিক থেকে ভেসে এলো 'হ্যালো আপা, কেমন আছেন?' কথা শুনে মনে হলো আমাকে খুব ভালো চেনে । আমি বললাম হ্যাঁ ভালো আছি । কে আপনি?
- আমাকে চিনতে পারছেন না? ঐ যে একদিন মেসেজ দিয়েছিলেন সে-ই আমি ।
- কোন মেসেজ? আমিতো ঠিক মনে করতে পারছিনা ।
- কেন আপা ধুমপান সম্পর্কে লিখেছিলেন মনে নেই?
- ও আচ্ছা মনে পড়েছে । তো কেমন আছেন আপনি?
- জি আপা ভালো আছি । আমি সেই দিন থেকে ধুমপান ছেড়ে দিয়েছি । আমার জন্য দোয়া করবেন ।
কথাটা বলেই তড়িৎ গতিতে লাইনটা কেটে দিল । ধরে নিলাম টাকা শেষ হয়েছে বলে কেটে দিল । শেষের কথাটায় আমি অবাক বিস্ময়ে বসে রইলাম । ভাবছি এটাও কি সম্ভব? জানার কৌতুহল-ই আবার আমাকে ফোন করতে বাধ্য করলো । কণ্ঠ শুনে মনে হয়েছিল বয়স কম । তাই এবার হ্যালো বলতেই তুমি করে বললাম । আচ্ছা তুমি কোথা থেকে বলছিলে?
- আপা আমার বাড়ি বরিশাল নাজিরপুর থানা ।
- কি নাম তোমার? হেসে দিয়ে বলল আমার নাম শিউলি ।
- তুমি সিগারেট পান করতে কেন?
- এখানে আমার মতো অনেক মেয়ে সিগারেট খায় সেই তালে তালে খেতাম ।
- ছেড়ে দিলে কেন? আবার একটু হেসে দিয়ে বলল সে অনেক কথা আপা ।
- বলো সমস্যা নেই । আমার মোবাইলে টাকা আছে ।
- আপা আমার নতুন বিয়ে হয়েছে স্বামী ঢাকায় থাকে । বিয়ের পনের দিন পর ও ঢাকা চলে গেল । হঠাৎ মেসেজ পেয়ে আমি নিশ্চিত আমার স্বামী জেনে গেছে আমি সিগারেট খাই । ভেবেছি হয়তো আমি লজ্জা পাবো ভেবে অন্য নাম্বার দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। তখনি আমি লজ্জা আর ভয়ে ধুমপান ছেড়ে দিয়েছি । দু'মাস পরে যখন বাড়িতে এলো আমি সাহস করে বললাম তুমি আমাকে এই মেসেজ দিয়েছ কেন, আমি কি সিগারেট খাই? তিনি অবাক হয়ে বললেন কই না তো আমি তোমাকে মেসেজ দিইনি। আমি চিন্তিত হয়ে বললাম কে দিল? সে আমাকে আশ্বস্ত করে বলল 'বাদ দেওতো এসব, ওরকম কতো মেসেজ আসে ।' আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললাম যাক বেঁচে গেলাম । তারপর সে চলে গেলে আপনাকে ফোন দিলাম ।
- ধন্যবাদ শিউলি ধুমপান ছেড়ে দেওয়ার জন্য । আমি তোমার সংগে আবার পরে কথা বলবো ।

মেয়েটি তড়িৎ গতিতে বলে উঠলো না না আপা আমাকে আর ফোন দিবেন না । আমার স্বামী যদি জেনে যায় আপনার সংগে আমার কিভাবে পরিচয় । আমিও হেসে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে শিউলি আর তোমাকে ফোন করবো না । আমিও একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম । আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে মনের অজান্তে বলে উঠলাম আমি সফল । ১০ জনের মধ্যে অন্তত একজনকে ধুমপান মুক্ত করতে পেরেছি ।

বাবা তোমাকেও ভালবাসি

এম, এম তোফাজ্জল হোসেন
ফ্যাক্টরি ম্যানেজার, অবনী ফ্যাশনস লিমিটেড

ব্যাবিলন পরিবারের এক অনন্য সৃষ্টি 'ব্যাবিলন কথকতা' । ব্যাবিলন কথকতার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পরে সংখ্যাট খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ি এবং বুকের ভিতর এক নতুন স্বপ্ন লালন করি । নিজেকে একজন লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার এটাই উত্তম উপায় । এছাড়া অন্য কোন উপায় চিন্তা করাও দুঃসাহসিকতা ছাড়া অন্য কিছু নয় । এরই ধারাবাহিকতায় বেশ ঘটা করে প্রস্তুতি নিয়ে ব্যাবিলন কথকতার দ্বিতীয় সংখ্যায় "পরিবেশ বান্ধব ব্যাবিলন" নামক একটি পরিবেশ সচেতনতামূলক লেখা দিয়েছি । যা যথারীতি ব্যাবিলন কথকতার দ্বিতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত হয় । কিন্তু মজার বিষয় হলো ব্যাবিলন কথকতার দ্বিতীয় সংখ্যা পড়ে ব্যাবিলন পরিবারের লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের লেখার ভঙ্গি, ভাষাগত নৈপুণ্য এতই চমৎকার বলে মনে হল যে, যা অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ লেখকদেরও হার মানায় । আর এতো চমৎকার ও সু-নিপুণ লেখনীর মাঝে আমার লেখাটি কথকতায় ঠাঁই পাওয়ায় আমি নিজে খুবই অভিভূত হই, পাশাপাশি নিজের মনের মধ্যে একটি অপরাধবোধ কাজ করেছে যে, হয়তো এএফএল-এর একমাত্র লেখক অথবা পদাধিকার বলে আমার লেখাটি কথকতায় স্থান পেয়েছে । এই অপরাধবোধ থেকেই তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম সংখ্যায় নিজেকে লেখালেখি থেকে গুটিয়ে রাখি । ১২ই মে রোজ বৃহঃস্পতিবার আনুমানিক সকাল ১১.০০টার দিকে ব্যাবিলন গ্রুপের পাবলিক রিলেশন্স ম্যানেজার শামীম ভাই আমার রুমে আসেন এবং খুব জোরালোভাবে সিলভার জুবিলি উপলক্ষে একটি লেখা দেওয়ার আহ্বান করলে আমি মৌন সম্মতি প্রদান করি এবং বিষয়টি নিয়ে আমার স্ত্রীর সাথে আলোচনা করলে সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পাশের বাড়ির সরকারী কর্মকর্তার মায়ের প্রতি নির্মম অত্যাচারের এক করুণ ইতিহাস বর্ণনা করে দুচোখের জল ছেড়ে দিয়ে উক্ত ঘটনাটি ব্যাবিলন কথকতায় লেখার জন্য অনুরোধ করে । বর্ণনাটি শোনার পর আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে যায় । উক্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটে সিলভার জুবিলি উপলক্ষে "মায়ের আঁচল" নামে প্রবন্ধটা লিখি এবং অধীর আগ্রহে থাকি কবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অর্থাৎ ১০ই জুন প্রকাশিত হবে আমার লেখাটি । উদ্দেশ্য ছিল একটাই স্ত্রীকে বলব তোমার কথার সূত্র ধরে লেখাটি সম্পূর্ণ করেছি এবং যথারীতি সিলভার জুবিলির স্পেশাল সংখ্যায় ঠাঁই পেয়েছে । কিন্তু না আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হলো না । ১০ই জুন আসার আগে ২৭শে মে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী আমাকে ছেড়ে দূরে বহু দূরে চিরদিনের জন্য চলে যায় । সেখান থেকে আর কোন দিন ফিরে আসবে না এবং আমাকে কথকতার লেখা সম্পর্কে কোন পরামর্শও দিবে না । এখানে একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয় স্পেশাল সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পরে এর দুইটি কপির একটি আমার মা এবং অন্যটি আমার বাবাকে দেই এবং তারা একই সঙ্গে আমার লেখাটি পড়তে শুরু করেন এবং দূর থেকে দেখতে পাই মা একটু বেশি হাস্যোজ্জ্বল এবং উচ্ছসিত যেন আত্ম-অহংকারে ভুগছেন এবং ইশারায় বাবাকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছেন । আর অন্য দিকে বাবার অবস্থা তার উল্টোটা তাই বাবার উদ্দেশ্যে বলছিঃ

একটি শিশুর জন্য বাবা হচ্ছেন সবচেয়ে বড় শক্তি । পরিবারের একটি শিশু তার নিষ্পাপ চোখে বাবাকে দেখে পরিবারের সবচেয়ে ক্ষমতাধর, জ্ঞানী, স্নেহশীল এবং পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে । মেয়ে শিশুরা জীবনের শুরুতেই আদর্শ পুরুষ হিসাবে বাবাকে চিনে । অন্যদিকে ছেলে শিশুরা চায় বাবার মত শক্তি অর্জন করতে তথা পরিবারের সর্বময় কর্তা হতে। এছাড়া শিশু যখন বাড়ন্ত হিসাবে থাকে তখন বাবা তার মূল্যবান উপদেশ দিয়ে সন্তানের জীবনের পথ বাতলে দেন । তাই বলা যায় মানব জীবনে বাবার অবদান অপরিসীম । সন্তানের জন্য বাবার ভালবাসা অসীম । দৃষ্টান্তস্বরূপ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর সন্তানের প্রতি ভালবাসার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে আছেন । তিনি সন্তান হুমায়ুনের জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবন ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি । এমন স্বার্থহীন যার ভালবাসা সেই বাবাকে সন্তানের খুশির জন্য জীবনের অনেক কিছুই ত্যাগ করতে হয় । প্রতি বছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবার বাবা দিবস পালিত হয় । এই দিবসে সন্তানের সামনে সুযোগ আসে বাবাকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানানোর ।

ভাল লাগার গান

মোসাঃ কুলসুমা আক্তার সাথী
কিউএআই, ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিমিটেড

গোলাপ ফুলে কাঁটা আছে
তবুও ভালো লাগে গোলাপ
ভালো লাগে তোমার সাথে
মিষ্টি মধুর আলাপ ।

ভাল লাগে বলতে সদা
তোমায় ভালোবাসি,
ভালো লাগে চপল চোখে
তোমার উচ্ছল হাসি ।

ভালো লাগে আঁধার রাতে
নীল জোনাকির আলো,
ভালো লাগে দুঃখের মাঝে
বাসতে তোমায় ভালো ।

ভালো লাগে তোমার হাতটি ধরে
অচিন পথে হারিয়ে যেতে খুব
ভালো লাগে তোমার নদীর জলে
আমি যেন কেবলই দিই ডুব ।

ভালো লাগে তোমার সাথে
নীল আকাশে ভাসতে যদি পারি
ভাল্লাগেনা তোমার সাথে শুধু
কখখোনো যে একটুকুনও আড়ি ।

ভালো লাগে শীত সকালে
তোমার সাথে মিষ্টি রোদের স্নান,
ভাল্লাগেনা আমার প্রতি তোমার
কোন কঠিন অভিমান ।

ভালো লাগে শুনতে তোমার
হৃদয় ঝরা গান,
ভাল্লাগেনা আমার জন্য তোমার
দুঃখ ভরা প্রাণ ।

ভালো লাগে ফুলের পাপড়ি জুড়ে
লিখতে তোমার নাম,
ভাল্লাগেনা কারো মুখে
শুনতে তোমার বদনাম ।

ভালো লাগে তোমার সাথে
অযুত দিবস রাত,
তুমি আমার সকল ভালবাসা
তুমি আমার প্রাণের পারাবাত ।

Babylon Does Not Manufacture the Ready-made Garments Only

Mohammad Hasan
Deputy General Manager
Babylon Group

Japanese car, Italian shoe, French perfume, Colombian coffee, New Zealand meat, German beer & Bangladeshi garment indicate the customers' taste & status. Bangladeshi garments would be found hung in most of the wardrobes of the developed countries.

Readymade garment industry (RMG) ranks highest in Bangladesh industries. RMG is a very labour intensive sector, which employs chiefly women workforces ensuring women empowerment. This industry requires low to medium technology and comparatively low investment. Young entrepreneurs of Bangladesh took the opportunity almost 3 decades back to initiate the industry in our country. The foreigners synonymously utter RMG industry when they talk about Bangladesh.

As an industry readymade garment is of low investment category compared to other sections of textile industry. From cotton to yarn to fabric to garment- the last one requires lowest investment. On the other hand fabric mills require high technology with less workforce.

As a labor-intensive industry RMG in Bangladesh enjoys a relatively lower rate of wages. This was one of the major reasons for the migration of garment industry into Bangladesh.

Bangladesh exported USD 10.7 billion in last year from RMG sector. Out of total export of the industry Babylon contributed $114 million, which is 1.07% of the total. For doing so Babylon has employed over 12 thousand people in its 14 different units. Though in terms of its export volume and industry size it is not very big but Babylon has a very unique position in the industry. Babylon has some significant features that deserve special mention.

Babylon does not compromise ever with quality of her products and is firmly committed to its valued buyers, suppliers and other business associates as well. Babylon is very conservative about borrowing money and taking excess orders beyond her capacity.

Babylon got ISO 9001:2000 certification on the quality management system in the year 2002 & ISO 14001 on the environmental management system in 2004. We have achieved BSCI & WRAP Platinum level certifification this year.

We are approved by Kohls, Tesco, Walmart, H&M, Sears/Kmart, Tema, Primark, Cato, Macy's, C & A, VF Asia, PVH, Springfield, Dimension, Jules, Kiabi, Zara, Charming Shoppes Inc., Next, Mothers Work, JC Penney, etc. Babylon does not count if the workers have prior experience or not. A newcomer gets training in the in-house Training Center before being placed in the production floor. Babylon's Employee Training Centre (ETC) is almost as old as the company itself. ETC provides basic training to the freshmen on labour law, health and safety issue, personal hygiene, technical know-how, social awareness, basic literacy etc. Through this Babylon has so far turned thousands of unskilled workers to skilled class.

Babylon believes that only technical knowledge is not sufficient to get the expected output from the workers. Rather mental nourishment with technical skill can boost up the health of the industry better. Babylon Kathokata, an in-house yearly magazine, takes care of the mental health of the Babylonians. The magazine is solely contributed and edited by the Babylon members and is published on 15th December of each year to mark the glorious Victory Day of Bangladesh. Renowned writers, poets, buying representatives unveil the first cover of the magazine, which is very rewarding for us. It is proven that a worker who takes up pen to write can't pick up a stick or iron bar to destroy his/her factory.

Apart from technical and mental health of workers Babylon cares also for physical health of her workers and people of the localities. Babylon Medical Services (BMS) is involved in this noble activity. BMS also helps government to execute its EPI program for the local community.

RMG is powered by women workers as almost 80% of RMG workers are female. Menstrual hygiene is an important factor in terms of welfare as well as productivity of the female workers. Owing to high price of sanitary napkins in the market female workers can hardly afford them. Most of them use old & unhygienic fabrics and suffer from various diseases. Considering the essence of hygienic lifestyle Babylon has launched an initiative to supply low cost sanitary napkin "Softy" to the female workers at affordable prices. This low cost sanitary napkin project has been installed in Babylon's own premises to bring the product to the reach of her workers at a very cheap price.

Education Stipend Program run by Babylon is another unique example for any garment factory. Poor students from SSC level having Golden GPA across the country are getting stipends for 2 years from Babylon Group. As a part of nation building program Babylon took this initiative in 2008. The students are being selected impartially from all over the country. Religion, cast, creed, gender etc. don't keep a student from receiving the stipend if only he/she has financial hardship to continue further studies and has obtained golden GPA in the SSC exams.

Babylon Library is another step of its commitment to the society. Babylon feels responsible to the people where most of its manufacturing units are located. Babylon facilitates a Library for the Tetulzhora High School, Savar. It is like a dream come true for any local level school but Babylon has done it for them as education comes as a priority to Babylon's CSR activities.

Apart from all above formal social initiatives Babylon also helps its own employees informally but regularly as per their different needs and this is not very insignificant in terms of financial figures.

In Babylon we have had the honour of welcoming the dignitaries like Ambassadors/High Commissioners of different countries in Bangladesh, US congressmen, UK secretary and many others to our premises. Babylon is recognized as a model factory by the industry's apex bodies. Any state guest, scheduled to visit any garment factory, the apex bodies usually would select us unanimously and we are proud of being the host of those special guests.

Babylon obviously is a business house but we don't think commercially all the time. In terms of export figures it contributes about 1% of the total industry export. It has created 12 thousand plus direct employment, and through its CSR activities it is trying to bring positive changes in the society. It does not look for profits in all its activities, rather Babylon believes in living together to make a society free from any sorts of discrimination.

Introducing Lean

AKM Shamsul Haque Shawon
Junior Manager, Research & Development
Woven Tops, Babylon Group

The core idea of LEAN is to maximize customer value while minimizing waste. Simply, LEAN means creating more value for customers with fewer resources.

A LEAN organization understands customer value and focuses its key processes to continuously increase it. The ultimate goal is to provide perfect value to the customer through a perfect value creation process that has zero waste.

To accomplish this, LEAN thinking changes the focus of management from optimizing separate technologies, assets, and vertical departments to optimizing the flow of products and services through entire value streams that flow horizontally across technologies, assets, and departments to customers.

Eliminating waste along entire value streams, instead of at isolated points, creates processes that need less human effort, less space, less capital, and less time to make products and services at far less costs and with much fewer defects, compared with traditional business systems. Companies are able to respond to changing customer desires with high variety, high quality, low cost, and with very fast throughput times. Also, information management becomes much simpler and more accurate.

Three Sources of "Waste"

- Waste: all movements and actions that don't add value but consume resources.
- Temporarily Necessary Waste: at pilot production of testing purpose.
- Pure Waste: can and should be eliminated immediately.

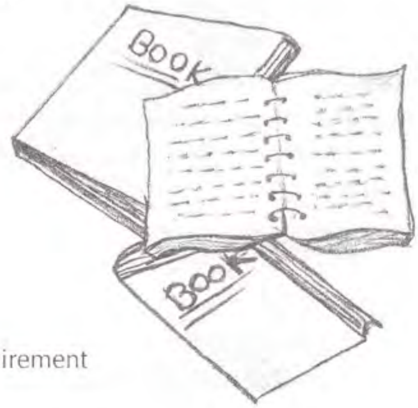

Let's see the Wastes (7 Original and 2 Additional Wastes)

- Overproduction
- Waiting
- Transportation
- Unnecessary processing
- Unnecessary inventory
- Unnecessary movement
- Defects or alters
- Manufacturing goods or services that don't meet the customer requirement
- Waste of human capital - unused human labor and talent

Four LEAN Goals

- **Improve Quality:** understand customer wants and needs and have processes to meet their expectation and requirements.
- **Eliminate Waste:** stop any activity that consumes time, resources or space but doesn't add value a customer is willing to pay for.
- **Reduce Time:** minimize start to finish time for a product is one of the most effective ways to eliminate waste.
- **Reduce Total Costs:** produce only to meet customer demand - no over production or unneeded stocks.

Six Additional Principles (from Womack and Jones)

- Solve the customers problems completely by ensuring that all the goods and services work and work together.
- Don't waste the customers' time

- ⇨ Provide exactly what the customer wants
- ⇨ Provide what's wanted exactly where it's wanted
- ⇨ Provide what's wanted where it's wanted exactly when it's wanted
- ⇨ Continually aggregate solutions to reduce the customers' time and hassle

Now, let's introduce some common elements used in LEAN

Elements	**Description**
6S (former 5S)	Sorting, Set in order, Shining, Standardize, Sustain, Safety.
Kaizen	Continuous Improvement (to make some small improvements to achieve a big one).
Kanban	Schedule production and minimize WIP (work in process) while encouraging improvement in many areas.
PoU Storage	The practice of storing inventory at the location where it is used rather than in a warehouse or other dedicated storage facility.
Value Stream Mapping	To visualize macro-level processes and their conformance to Toyota Production System (TPS) principles.
SMED	to minimize setup time and cost thereby freeing capacity and enabling the production of very small lots.
Six Sigma	Improve quality and process capability using statistical method.
Takt Time	To balance the output of sequential production processes and prevent inventory buildups and shortages.
Visual Management	To provide immediate, visual information that enables people to make correct decisions and manage their work and activities.
Work Balancing	To minimize idle time for people and equipment.
Work Simplification	Reduce wasted time and motion at micro level.
Jidoka	Prevents problem in one station of a production line from building inventory and also creates urgency to find permanent solutions.

Steps to Achieve LEAN Factories

Everyone (workers to managers) needs to own the leaning of the company and to benefit from it. Eliminate waste from the whole of the company not just one production line, i.e.

- ⇨ Technical and product development
- ⇨ Procurement
- ⇨ Manufacture
- ⇨ Sales and marketing
- ⇨ Accounts
- ⇨ Delivery
- ⇨ Transport

Finally, a question to you all **Who benefits most from LEAN in a factory?**

- ⇨ Owner?
- ⇨ Worker?
- ⇨ Customer?

If you are interested to know about LEAN Resources, please visit: http://www.iienet2.org/Default.aspx

Some other resources:
Toyota's Website
Toyota's Georgetown (Kentucky) Website
Toyota's NUMMI (California) Website
LEAN Enterprise Institute.

Some Thoughts Vibrate

Masud Rana
Senior Officer, Commercial Department
Aboni Knitwear Limited

On 4th of March 2011 Babylon Group inaugurated Softy, the cheapest hygienic sanitary napkins, for all its women workers. This is one of the most significant approaches towards corporate social responsibility of Babylon's among other ones such as winter clothe distributions, financial support to meritorious students, fair price shop for workers with families and medical service facilities to all workers and staff.

*Why Softy is one so noteworthy among others? This proposal had come from a college student & the members of our top management were fascinated with it & they put all their valuable time & fiscal supports to make this scheme a successful one. So Babylon gives us confidence to put forward resourceful thoughts & ideas as well. Here I have some suggestions to put forward-

*We could introduce one-week fatherhood leave for the male employees. IBM offers paid fatherhood leave to their male employees. IBM customarily gives fathers two weeks' paid vacation after the birth of a child. Though this is not logical to compare Babylon Group with IBM but it could form an example & be a courageous step, which could be followed by others in upcoming days. We understand the need for fathers to form a bond with the newborn babies just like the mothers do. Lots of young employees work here will get benefited from the leave & enjoy the fact of becoming fathers.

*Babylon Fitness Club can be introduced even for all its corporate level employees. It's definitely going to boost up the physical & mental health equally to perform daily activities more smartly & precisely. One or two hours workout routine, at least three days per week are more than enough to keep us physically healthy, mentally fresh & will help us to stay away from some common illnesses like heart disease, diabetes & many more.

We all remain busy throughout the day. Our nature of job demands that kind of engagements. Generally time difference between Bangladesh & our entire counterparts like EU countries; USA & Canada impacts on our work in a big way. By following that kind of time spans our energy level reaches the bottom at the end of the day. After a hectic day, it's hardly possible to attend a private gym for workout. Let's not talk about the heavy traffic jam barriers on our daily street movements. It's a common and regular schedule of wasting time, money, and energy.

When I say – I hear, read or write the word "Babylonian"; it portraits a picture of a legendary courageous soldier's fighting for the victory.

I wish Babylon a long life. Hope it keeps going with its various path-breaking accomplishments.

Keep all your individual positive thoughts alive & share your dreams. Surly one of these will flourish some day. Just to wait for the right time & correct place to come to.

One family can change one family; a group of families can change a society; a group of societies can change a country & a country can change all other countries in the world. Thus we can change our planet by making some positive approaches.

A Piece of My Mind for You

Salma Sultana
Officer Admin, Babylon Group

A new working place is a new feeling.

I was new in this office so it was a new experience for me as well, but the experience was a kind of a difficult one. On my first day at Babylon I felt like a fish out of the sea (as I'm from the coastal city) put in a small jar just to respire so long as I lasted. I was feeling like I was thrown into an isolation (sorry guys but couldn't help feeling that way). I also felt stifling inside the four walls. But it wasn't because I had problems with my new colleagues; on the contrary I found them to be hundred times better than my expectations. The actual fact was that the sudden loss of my old friends and the blissful days that I had passed with them were too exciting for me to forget.

Working in Cantonment English School & College seemed to work in the midst of nature. Just outside the fence of the compound there were hills where we often found roaming pigs and deer. And on the other side was the rail lines for the university shuttle trains to pass. It offered a haven of peace and serenity for the students, away from the bustle of the city. It was my good fortune that I worked there and it's my misfortune also that I quit that job. I needed to fight against myself to forget all those days. But the constant phone calls from them (my CESC colleagues and students) scarcely helped me do that (did I really want to?).

I was feeling as if a piece of my heart was taken away and I was working like a doll powered by a battery cell. I thought the void created in me after leaving CESC would never be filled. It would be very hard for me to be adjusted in Babylon. But at last collecting every bit of courage that I had with me, I stepped forward.

I started looking for good things about Babylon and found them there in plenty. Before joining Babylon I wandered how good a garment factory possibly could be and feared I would hardly get any colleagues of my liking. But I was proved wrong. I found a quite bearable working environment. To me environment meant not only the room, or the building, or the area or the facilities I was getting, but also the people I had to work with. And no doubt they were all very reasonable.

On my first day at Babylon I did not see Sohely. Jennifer was the only person who stood beside me from the very first day. She was always pretty sweet to me. Later I met Sohely. Before that I had talked to her several times over phone and thought she would be a very moody one but in reality I found her to be quite opposite to my assumptions. She was so junior to me by age but still acted as my local guardian, promised to herself not to let any harm befall me. Now both Sohely and Jennifer are my fun chums. Only they know how much fun I am fond of! And Urmi, the earnest accountant, is now my mail mate. All the charming mails she gets from elsewhere she enjoys sharing them with me.

It would be an unpardonable mistake if I forget here to mention Pappu. Whenever I had a problem and needed someone to discuss with he was always there with a big smile. Thanks a lot, Pappu.

My closest neighbors (sit beside my sitting area) behave so delicately and passionately with me as if I'm a fragile piece of china and anytime can be made to pieces.

What will I tell about my task; I didn't have the slightest knowledge about the job in a garment factory before my joining. When I attended the first official meeting all the terms used by the speakers seemed Latin and Greek to me. I had no idea whether the word (any unknown word uttered in the meeting) was the name of a fabric, a

buyer or a style of a garment. I was brailing each words coming out from their mouths like a blind girl.

I was so lucky because after the meeting no one frowned at me when I went to him or her with my queries. And I was sure they didn't even laugh behind my back at my ignorance. Thanks to all those people. In the second meeting I found the words familiar and the third one made them quite known to me.

Whoever will read this piece of writing will perhaps scan it in search of some names that are nowhere to be found. Yes, I'm talking about my superiors. Purposely I didn't mention them as it might look like flattery from my side. My respect and honour for them is beyond question, it doesn't matter if I bring it out in the open or not.

And the super superior, is just a man of knowledge, possessing an envious personality with immense simplicity. I didn't know how anyone could remain so expressionless when praised. I daren't write about him in legible words. But I've written with my inaudible heartstrings for him with invisible ink (I've borrowed this idea of invisible ink from someone and it really works).

I'm so grateful to them all around me at Babylon for accepting me warmly. I won't forget their bounty to me.

অপরাজিতা

জান্নাতুল ফেরদৌস ইরা
ওয়েলফেয়ার অফিসার
সুরভী গার্মেন্টস লিমিটেড

ওদের দু'নয়নে অশ্রু ঝ'রে
বিষন্ন হতে দেখেছি ।
দু'চোখের জল মুছে
মুখে হাসি ফুটিয়ে চলতে দেখেছি ।
নিষ্ঠুর আঘাত ভেঙ্গে, দৃঢ় প্রত্যয় নিতে দেখেছি ।

তাদের সান্নিধ্যে অনুধাবন করেছি ।
দুঃখের চাদর বিছানো গল্প শুনেছি ।
তাদের কথাগুলোকে রূপকথা সাজিয়ে
কবিদের মনের মাধুরী মিশিয়ে
কবিতাগুচ্ছ থেকে, গল্প কাহিনী হতে দেখেছি ।

তাদের বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা,
বিষাদ রোদন স্পর্শ করেছি ।
নীরব ধারায় সেই রোদনকে গড়াতে দেখেছি ।

তাদের সরল ভালবাসা অনুভব করেছি ।
আলো-আঁধারের মাঝে-
নীল বেদনাকেও ভাসতে দেখেছি ।

বেদনার পাঁজর ভাঙ্গা হৃদয় নিয়ে,
মুক্ত নীলাকাশের নিচে দাঁড়িয়ে-
নিঃশ্বাস নিতে দেখেছি ।

অর্ধাঙ্গিনীরূপে অগ্নি শিখায় জ্বলতে দেখেছি ।
আবার মমতাময়ী হয়ে
স্নেহ স্পর্শ করতে দেখেছি ।
কখনো আবার শিল্পীর রং তুলিতে
মোনালিসা হতে দেখেছি ।

ওরা দুর্জয়
ওদের উপমা ওরাই,
হয়তো বা কারো মা, কারো বা মেয়ে
অথবা কারো সহধর্মিনী ।

সিলভার জুবিলির বিশেষ ক'টি মুহূর্ত

(A few snapshots from Silver Jubilee Celebration of Babylon Group)

Babylon Directors are inaugurating the programme of Silver Jubilee by releasing balloons and pigeons in the air.

Babylon Directors are cutting the cake of Silver Jubilee in the presence of some children and many local and foreign guests.

The Babylon artists are presenting the Babylon Song at the beginning of the celebration on 10th June, 2011.

Mr. Henrik Johannesen from Eurotex Apparel, Denmark, is speaking on the occasion of Silver Jubilee on 10th June, 2011.

Managing Director of the Prime Bank Mr. M. Ehsanul Haque is giving a speech on the historic evening of Silver Jubilee.

Mr. Abdus Sadeque Bhuiyan, Executive Vice President of Islami Bank, is narrating the relation of Islami Bank with Babylon Group through his speech.

সিলভার জুবিলির বিশেষ ক'টি মুহূর্ত

(A few snapshots from Silver Jubilee Celebration of Babylon Group)

Babylon Directors along with few employees are holding the crests which were offered to them by their employees.

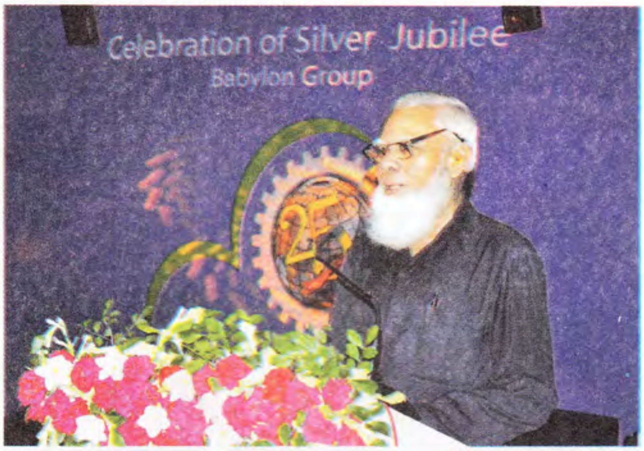

Mr. M. J. Abedin, Principal Partner of the audit firm M. J. Abedin & Co., is sharing part of his memories from his long acquaintance with Babylon Group.

Director of Impress Group, Mr. Reaz Ahmed, is holding the attention of the audience while giving an encouraging speech in his habitual humorous way of talking.

Babylon Director Mr. Neesar Ahmed is awarding crest to Mr. Solaiman Ali, who has been serving the company since 1986.

Mr. Gurmej Malhi, representative of Result Clothing (UK), is seen presenting a huge flower bouquet on the occasion of Silver Jubilee.

Two Babylon artists are seen taking part in the Fashion Parade.

Plot # 169-171, Union-Tetuljhora, Hemayetpur, Savar, Dhaka, Bangladesh.
Tel: 7711962, 7713652, 7713502; Fax: 88-02-7713502

Juniper Embroideries Ltd.

(Established - 1989)

Has 17 sets of computerized 7/9 color embroidery machines of Barudan (Japan) brand and one set of Tajima (Japan) brand. Most of the machines have 20 heads each. All these are capable of performing embroideries on both light and medium weight materials. JEL has its own Tajima design punching software & editing software stitch pro.

- Location : Hemayetpur, Saver, Dhaka.
- Man Power : 280
- Area : About 10000 sq-feet
- Electricity : Gas Generator
- Capacity : 15000 pcs/day (3 Shifts)
- Major Buyers : H&M, Tema, Tesco, David Howard, Celio, Springfield, Tchibo, Fishbone, Smog.

Plot # 169-171, Union-Tetuljhora, Hemayetpur, Savar, Dhaka, Bangladesh.
Tel: 7711962, 7713652, 7713502 Fax: 88-02-7748502

ব্যাবিলন গ্রুপের প্রতিষ্ঠানসমূহ:

- ব্যাবিলন গার্মেন্টস লিঃ
- ব্যাবিলন ড্রেসেস লিঃ
- সুরভী গার্মেন্টস লিঃ
- অবনী ফ্যাশন্স লিঃ
- অবনী টেক্সটাইলস লিঃ
- অবনী নীটওয়্যার লিঃ
- জুনিপার এমব্রয়ডারীজ লিঃ
- ব্যাবিলন ট্রিমস লিঃ
- ব্যাবিলন ক্যাজুয়ালওয়্যার লিঃ
- ব্যাবিলন ওয়াশিং লিঃ
- ব্যাবিলন বায়িং সার্ভিসেস লিঃ
- ব্যাবিলন আউটফিট লিঃ
- ট্রেন্ডজ
- ব্যাবিলন প্রিন্টার্স লিঃ
- ব্যাবিলন মেডিক্যাল সার্ভিসেস
- ব্যাবিলন লজিস্টিক্স

Head Office:

2-B/1 Darus Salam Road, Mirpur
Dhaka-1216, Bangladesh.
Tel : 8023495-6, 8023462-3 (Off)
9007175, 9010533, 8011089 (Fac)
Fax : 880-2-8032949
E-mail : babylon@babylon-bd.com
Web : www.babylongroup.com